দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

জনমোহিনী প্রকল্প গড়ে দেনার দায়ে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ— পৃঃ ২৪

সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে রাশিয়ানরাই ছিলেন ব্রাত্য — পৃঃ ১৩

৭৪ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ২৫ এপ্রিল, ২০২২।। ১১ বৈশাখ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

শ্রীলঙ্কার পথে পশ্চিমবঙ্গ?

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE™ NEW AGE PANELS
SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ।।

৭৪ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ১১ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৫ এপ্রিল - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘নৈরাজ্য বঙ্গে’ নিঃসঙ্গ মমতা ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদিকে সাংবাদিকতা শেখাবেন না প্লিজ ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

ভারতে জ্বালানি তেলের দাম সত্যিই কি দেশবাসীকে নাস্তানাবুদ করছে ◻ করণ ভাসিন ◻ ৮

অতি দর্পে হতা লঙ্কা ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১১

সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে রাশিয়ানরাই ছিলেন ব্রাত্য ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১৩

চব্বিশের পথ অনেকটাই মসৃণ করলো উত্তরপ্রদেশ ◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ১৫

নবাবের বংশপরিচয় থেকে হিন্দু বংশলতিকায় ◻ কৌশিক রায় ◻ ১৭

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেননি সাঞ্চা তেনজিন ◻ সন্দীপ চক্রবর্তী ◻ ১৮

পশ্চিমবঙ্গ আগের ঋণের সুদ মেটাতে আবার ঋণ করে ◻ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ◻ ২৩

জনমোহিনী প্রকল্প গড়ে দেনার দায়ে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ ◻ ভবানীশংকর বাগচী ◻ ২৪

ভারতের অঙ্গরাজ্য বলে বেঁচে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ◻ পায়েল চ্যাটার্জি ◻ ২৬

জনকল্যাণমূলক অর্থনীতিই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে পারে ◻ ড. জয়ন্ত দত্ত ◻ ২৭

হনুমানের জন্মস্থানের খোঁজ মিলল তিরুমালা পর্বতাঞ্চলে ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৩১

পুরুকে দেখে আলেকজান্ডার বুঝেছিলেন ভারতজয় অসম্ভব ◻ ওমপ্রকাশ ঘোষ রায় ◻ ৩৩

আন্দামানে সাভারকরকে নিয়ে কনভেনশন ◻ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৩৫

পাখি পাহাড়ের ছবি দেখে অবাক হতে হয় ◻ অমিত চৌধুরী ◻ ৩৭

মুসলমান ও জনজাতিদের রাজনৈতিক জোট চাননি আম্বেদকর ◻ অসিত চক্রবর্তী ◻ ৪৩

বাংলাদেশের স্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো বাদ দিলে কেমন হয়? ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৪৪

বন্দি জীবনে রামায়ণ ছিল বারীনের নিত্যসঙ্গী ◻ দীপক খাঁ ◻ ৪৫

কোভিডে এদেশে মৃতের পরিসংখ্যান নিয়ে হু-র তথ্য-কারচুপি ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
২ মে
২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গে ভোট-সন্ত্রাস

বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ ভোট দেননি। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নির্বাচনকে আজকাল ভয় পেতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে যারা তৃণমূলের ভোটার নন তাদের ভয় সব থেকে বেশি। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ভোটে জেতার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস কতটা নৃশংস হতে পারে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় পশ্চিমবঙ্গে ভোট-সন্ত্রাস। লিখবেন বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ।

দাম একই থাকছে, বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani**
Kolkata-71

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার পাঠক, গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের জানানো হচ্ছে যে, বিশেষ কারণবশত আগামী ৪ জুলাই, ২০২২ সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র প্রতি কপির মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭০০.০০ টাকা করা হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলো, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আশাকরি আপনারা আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

আগামী জুলাই মাস থেকে স্বস্তিকায় দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় পাঠাবেন—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**
Sreemani Market Branch, Kolkata - 700 006

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আর্থিক সংকটে পশ্চিমবঙ্গ

সকলেই স্বীকার করিবেন যে মানব সভ্যতায় অর্থ একটি অনবদ্য সৃষ্টি। ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের মতো রাষ্ট্রজীবনেও অর্থের এক বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। ব্যক্তি জীবনের মতো দেশ বা রাজ্যকেও অর্থ সমৃদ্ধ করে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই একটি দেশ বা রাজ্যের সবকিছু প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অর্থের যদি অপচয় করা হয় কিংবা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থেই তাহা ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অর্থই অনর্থ ডাকিয়া আনে। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে অর্থকে মা লক্ষ্মীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মা লক্ষ্মী হইলেন চঞ্চলা। হীন স্বার্থে ব্যবহৃত হইলে ভাঁড়ারে টান পড়িবে। তখন ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ইদানীং ভারতের কয়েকটি রাজ্য হীন স্বার্থে অর্থ ব্যবহার করায় তাহাদের ভাঁড়ারে টান পড়িয়াছে। ফলত তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিও রহিয়াছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বিশেষজ্ঞরা প্রধানমন্ত্রীকে জানাইয়াছেন যে, পঞ্জাব, দিল্লি, তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সহিত পশ্চিমবঙ্গও অর্থনৈতিক দিক হইতে বিপজ্জনক অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদের ভাঁড়ার একেবারে শূন্য হওয়ায় সাঙ্ঘাতিকভাবে তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থা সেই রাজ্য সরকারগুলি নিজেরাই সৃষ্টি করিয়াছে। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য তাহারা বেহিসাবি দান খয়রাতির রাজনীতি করিয়াছে। খয়রাতির প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করিয়া রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্থায়ী উন্নয়নের দিকগুলি উপেক্ষা করিয়াছে। ফলে রাজ্যের সার্বিক বিকাশ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বিনামূল্যের বিভিন্ন জনমোহিনী প্রকল্প চালু করিয়া রাজ্যের কিয়দংশ মানুষকে ভিখারি মনোবৃত্তি সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে। রাজ্যে কর্মসংস্থান নাই, শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ, যোগ্য চাকুরি প্রার্থীরা হা-হুতাশ করিতেছেন, কিন্তু লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মাত্র পাঁচশত টাকা পাইবার লোভে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। জানা গিয়াছে, আর্থিক সংকটের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও বন্ধ হইয়া যাইবে। রাজ্যের মুখ্য সচিব নাকি ইঙ্গিত দিয়াছেন, রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সংকটে, তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য বৎসরে কুড়ি হাজার কোটি টাকার সংস্থান করা কোনো মতেই সম্ভব নহে।

দান খয়রাতির রাজনীতির জন্য ক্রমাগত ঋণ লইতে লইতে ইদানীংকালে পশ্চিমবঙ্গের মাথায় ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজারকোটি টাকার অধিক। অর্থ বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা শ্রীলঙ্কা অথবা গ্রিসের মতো ভয়ংকর হইতে আর বিলম্ব নাই। জনমাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের এই বিপুল পরিমাণে ঋণের কথা প্রকাশ করিবার জন্য রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে তাহারা গালমন্দ করিতেও ছাড়েন নাই। ঋণজালে জড়াইয়া পড়িবার সমস্ত দায় তাহারা পূর্বতন বাম সরকারকে দিয়াছেন। তাহাদের সাফাই হইল, বাম আমলের ঋণ শোধ করিবার জন্যই এত ঋণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যে মেলা-খেলা ও ডোল বিতরণের রাজনীতি করিয়া রাজ্যটিকে দেউলিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার জবাব কে দিবে?

এই কথা সত্য যে, এই রাজ্য তথা রাজ্যবাসীকে আর্থিক সংকটে ফেলিবার এই প্রক্রিয়া বাম আমল হইতেই শুরু হইয়াছে। একদা নৈহাটি হইতে বজবজ পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীর বরাবর বহু শিল্পসংস্থার নানাবিধ উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। তখন পশ্চিমবঙ্গ আর্থিকভাবে অগ্রগণ্য রাজ্যের তালিকায় ছিল। শ্রেণী সংগ্রামের রাজনীতি করিয়া, মালিক-শ্রমিকের লড়াই লাগাইয়া কমিউনিস্টরা শিল্পসংস্থাগুলির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটাইয়াছে। চৌত্রিশ বৎসরে তাহারা রাজ্যটিকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ছাড়িয়াছে। ২০১১ সালে ক্ষমতা হইতে অপসারণের সময় তাহারা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ রাখিয়া গিয়াছে। ২০১১ হইতে ইদানীং কাল পর্যন্ত বর্তমান রাজ্য সরকার তাহা আবার কয়েক গুণ বৃদ্ধি করিয়া রাজ্যটিকে পথে বসাইতে চলিয়াছে। রাজ্যে এইমাত্র যে শিশুটির জন্মগ্রহণ করিতেছে তাহারও মাথায় ৮৫ হাজার টাকা ঋণের বোঝা চাপিতেছে। অর্থ বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, একদিকে বিভিন্ন খয়রাতি প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ খরচ, অন্যদিকে পুরানো ঋণের আসল ও সুদ মিটাইতে নূতন করিয়া ঋণ গ্রহণ — এই চক্রের মধ্যে পড়িয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের আর্থিক ঘাটতি মিটাইবার জন্য পূর্বতন বাম সরকার যেইরূপ শহরে ও গ্রামে মদের লাইসেন্স পাইকারি হারে দিয়াছিল, বর্তমান তৃণমূল সরকারও সেইভাবে আরও বেশি নূতন নূতন মদের দোকান ও বার খুলিবার অনুমতি দিতেছে। ফলে মাতালে রাজ্যটি ভরিয়া গিয়াছে। এই মাতাল ও সমাজ বিরোধীরাই হইল বর্তমান শাসকদলের শক্তি। সর্বদিক হইতে পশ্চিমবঙ্গ যে শীঘ্র গতিতে ভয়ংকর এক খাদের কিনারায় পৌঁছাইতেছে, তাহার জন্য সর্বস্তরের মানুষের এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নতুবা আরও ভয়ংকর দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ।।

উপস্থিত সুখ যেমন ভোগ করতে হবে, উপস্থিত দুঃখও তেমন ভোগ করতে হবে। সুখও দুঃখ চক্রের মতো পরিবর্তন হয়।

‘নৈরাজ্য বঙ্গে’ নিঃসঙ্গ মমতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ঘরে বাইরে অশান্তিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর একটাই স্বস্তি দু'টি নির্বাচনে রাজ্য বিজেপি হতবল হয়ে গিয়েছে। জোড়া- তালি দিয়ে সারাতে সময় লাগবে। তার মধ্যে ঘর গোছাতে চান মমতা। বালিগঞ্জের ভোটে সিপিএমের ২৫ শতাংশ উত্থান হয়েছে। তা তাৎক্ষণিক কিনা পরে বোঝা যাবে। সেখানে আনুমানিক ৫০ হাজার বা ২০ শতাংশ ভোট কম পড়েছে। ওই ভোট পড়লে সিপিএমের কী হতো তা বলা শক্ত। যদিও মনে মনে মমতা জানেন সিপিএম ‘ফিনিক্স’ পাখি। মরেও মরে না। পর পর নির্বাচন হেরে রাজ্য বিজেপি আপাতত ল্যাজেগোবরে। ফলে দল ছাড়ার হিড়িক পড়েছে। অপদার্থতার বিষ উগরে দিয়ে নদীয়া আর মুর্শিদাবাদ থেকে ১৪ জন দল ছেড়েছেন। বালিগঞ্জে বিধানসভার ৩০ হাজার ভোট এক ধাক্কায় ১৩ হাজারে নেমে এসেছে। এই কেন্দ্রে ৪২ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটার। বিজেপি নেতারা চোখ উলটে অর্থহীন সাফাই দিচ্ছেন, ‘ওটা আমাদের কেন্দ্র ছিল না।’ তাহলে কেয়া ঘোষের মতো একনিষ্ঠ কর্মীকে কেন বলির পাঁঠা করা হলো? উত্তর নেই। আসানসোল ভোটে শুধু পাণ্ডবেশ্বর, বারাবনি, জামুড়িয়া, আর রানিগঞ্জেই তৃণমূলের কাছে ল্যাজেগোবরে হয়ে ২ লক্ষ ভোটে পিছিয়ে পড়ে বিজেপি। পাণ্ডবেশ্বরেই তারা ৯০ হাজার ভোটে হেরে যায়। অথচ একবছর আগে মাত্র তিন হাজার ভোটে এই কেন্দ্র থেকে হেরেছিল তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে আসা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। উপনির্বাচনে বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করেনি।

বিধানসভা ভোটে এইসব কেন্দ্রে তৃণমূলের চেয়ে ৩ থেকে ১৫ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল বিজেপি। উপ- নির্বাচনে তা বেড়ে ৩০ থেকে ৯০ হাজার হয়ে যায়। ৭৯৩ ভোটে জিতে দলের মুখ রক্ষা করেছে কুলটি। বিজেপি নেতারা হাস্যকর দাবি করছেন যে, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে তারা এই কেন্দ্র জিতে নেবেন। বালিগঞ্জ উপনির্বাচনের ফল দেখে রাজনৈতিক মহল বলছে মমতার সংখ্যালঘু ভোট সরে যাচ্ছে। আমার ধারণা বাবুল-বিরোধী ভোট দিয়েছে বালিগঞ্জের তৃণমূল সমর্থক সংখ্যালঘু ভোটাররা। বাবুল বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে জায়গা পাওয়ায় তারা মোটেই খুশি ছিলেন না। বিজেপিতে থাকার সময় বাবুলের বহু সংখ্যালঘুবিরোধী কাজকর্ম তুলে ধরে বিরোধীরা। তাই ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২টিতে (৬৪ আর ৬৫) ২০০-র বেশি ভোটে এগিয়ে যায় হারিয়ে যাওয়া সিপিএম। বাকিতে তারা দুয়ে চলে আসে।

সংখ্যালঘু ভোট মমতার বুনিয়াদ। রাজ্যের ২৯৪- এর মধ্যে ১২৪ আসনে মমতা কায়েম রয়েছেন তাদের জোরেই। ৭৬টি আসন সংখ্যালঘু নিবিড়। রাজনৈতিক মহল বলছে, মমতার থেকে একদিকে যেমন সরছে সংখ্যালঘু ভোট, অন্যদিকে দলীয় চক্রব্যূহের ‘সপ্তরথী’কে বধ করতে উদ্যত ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে এক সপ্তাহের জন্য যে সপ্তরথী তাঁকে ধ্বংস করবে বলে ঘুঁটি সাজিয়েছিল, তাঁর পদ বিলোপ করেছিল, সেই ব্যূহ ভাঙতে রথচক্র ঘোরাচ্ছে অভিষেক। দু'জন ইতিমধ্যেই ধরাশায়ী। বাকি পাঁচ নিশানায় রয়েছে। তাদের সরিয়ে দলকে নিষ্কলঙ্ক করতে চান অভিষেক। অবশ্য তিনি নিজেও অভিযুক্ত।

একসময় এরা সকলেই মমতা ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অনেকদিন থেকেই এই বৃদ্ধচক্র ভাঙতে উদ্যত অভিষেক। তাদের অভিসন্ধি ছিল আইপ্যাকের সঙ্গে মমতা ও অভিষেকের সম্পর্ক ভাঙার। তা ভেস্তে যায়। দলের মুখপাত্র ও পুরোনো সাংসদ কুণাল ঘোষ ঠারেঠোরে তাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছেন। জাতীয় কমিটি থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বৃদ্ধ সাংসদ সৌগত রায় মমতাকেই তাক করে বসেছেন। হাঁসখালির ঘটনাকে ‘লজ্জাকর’ বলে মন্তব্য করেছেন। ২০০৭ এ রিজওয়ানুর কাণ্ডে মুখ থুবড়ে পড়েছিল সিপিএম। পালে হাওয়া টেনে সিপিএম নিধন করেন মমতা। কেটে যাওয়া মাথা আর জোড়া লাগাতে পারেনি সিপিএম। ২০২২-এর পৌরভোট আর বালিগঞ্জ উপভোটের পর হারানো জমি ফিরছে বলে দাবি ক্ষয়িষ্ণু সিপিএমের। তবে আপাতত নৈরাজ্য বঙ্গে নিঃসঙ্গ মমতা। বিজেপি একটু ব্যাকফুটে।

রাজনৈতিক মহল বলছে, মমতার থেকে একদিকে যেমন সরছে সংখ্যালঘু ভোট, অন্যদিকে দলীয় চক্রব্যূহের ‘সপ্তরথী’কে বধ করতে উদ্যত ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিদিকে সাংবাদিকতা শেখাবেন না প্লিজ

প্রিয় দিদিভাই,

আজকাল সাংবাদিকদের দেখলে আমার ঘেন্না হয়। ওঁরা কি লেখাপড়া করেছে? মনে প্রশ্ন তৈরি হয়। আসলে দিদি আপনিই আমার চোখে আঙুল দিয়ে সবকিছু নতুন করে দেখতে শিখিয়েছেন। আমি সাংবাদিকদের খুব মহান চোখে দেখতাম। আসলে আপনাকে দেখে দেখেই আমার ওঁদের প্রতি সম্মান তৈরি হয়েছিল। আপনাকে তো কমদিন দেখছি না। সেই যখন আপনি কংগ্রেসে ছিলেন তখন থেকে। তারপরে তৃণমূল হলেন। দেখেছি, এই সাংবাদিকরাই আপনাকে পরিচিতি দিয়েছে। এখনও একদল সাংবাদিককে আপনার সঙ্গে সব সময় ঘুরতে দেখি। এমনকী আপনার দলের সঙ্গে বেশি যোগাযোগ রাখার জন্য এঁদের অনেকে সিবিআই, ইডির তলব পেয়েছে। কয়েকজন জেলও খেটে এসেছে। এঁরা অবশ্য একটা সময় আপনাকে কাগুজে বাঘ মনে করত। বলতে খবরের কাগজ না থাকলে আপনি নাকি আপনি হতেই পারতেন না। কালীঘাটের বাইরে আপনাকে চিনিয়েছে এই এরাই! এখন তো আপনাকে গোটা দেশ চেনে। তবে খ্যাতির জন্য কি না সেটা বলত পারব না। সে যাই হোক, সাংবাদিকরা না থাকলে কি আপনাকে কেউ চিনত না!

হুঁঃ। আমি একদম বিশ্বাস করি না। এক সময়ে করতাম। ভাবতাম সাংবাদিকতা একটা বড়ো পেশা। সেই পেশার মানুষেরা অনেক কষ্ট করেন। লেখাপড়া করেন। ঝড়জল থেকে যুদ্ধ সবেতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেটা অবশ্য এখনও বেশি। কিন্তু তবু ওঁদের উপরে রাগ হচ্ছে, ঘেন্না হচ্ছে। কেন হচ্ছে জানেন দিদিভাই, ওঁরা বগটুই নিয়ে খবর করেছে বলে, হাঁসখালি নিয়ে সব কথা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে বলে। ওঁরা কেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছেলের রাগের মাথায় উপাচার্যকে গাগিগালাজ করার ছবি টিভিতে দেখিয়ে দেবে? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কলার ধরার কথা তৃণমূল নেতা বললে সেটা রাষ্ট্রসুদ্ধ সবাইকে শোনাতে হবে? কেন? কেন করবে? ছোটো ছোটো বিষয় নিয়ে খবর করার কী মানে আছে? পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমের পড়ে থাকা উচিত ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে। আপনার কথায় সূত্র ধরেই বলি, ওঁদের টুটি টিপে মেরে ফেলা উচিত।

আপনিই তো মারার রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছেন। সবাইকে বলেছেন বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিতে হবে। আর বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেলে খবরের কাগজ লাটে উঠবে। খবরের কাগজ লাটে উঠলে প্রথমে মাইনে কমবে, তারপরে বন্ধ হয়ে যাবে। বউ-বাচ্চা, বাবা-মা সমেত সাংবাদিকগুলো অক্কা পাবে। এর আগে একজন তো সবাইকে পথে বসিয়ে ছিল। আপনি তাঁকে চেনেন না দিদিভাই। নাম, সুদীপ্ত সেন। সবাই যেটা মিথ্যা বলে যে, ওই লোকটার সঙ্গে আপনার নাকি ডেলো না হেলো কোথায় একটা মিটিং হয়েছিল। সেই লোকটা জেলে। এদিকে তার কাগজ, টিভিতে কাজ করা ছেলেমেয়েদের কী অবস্থা হয়েছিল ভাবুন তো! তবে আপনার পিছনে যাঁরা লাগে তাঁদের তেমনটাই হওয়া উচিত।

দিদি সেদিন আপনি ওই যে হাঁসখালির কথা বলতে গিয়ে রেগে গেলেন তখন আপনিই বলেছেন যে, জেলার সাংবাদিকরা নাকি খেতে পায় না। এটা কী বললেন দিদি! আপনি মাঝে মাঝে এমন সব বলে ফেলেন যে আমার খুব রাগ হয়। বড়দিদি বলে কিছু বলতে পারি না। আর আপনি তো প্রশ্ন শুনতে পছন্দও করেন না। তবু আজ চিঠিতে বলেই দিই। আপনার রাজ্যের সাংবাদিকরা অভাবে খেতে পায় না এটা বলা কি ঠিক! ওঁরা তো আপনারই প্রজা। ওঁদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়টা তো আপনারই দেখা উচিত। জানেন দিদি, আপনাকে একটা কথা না জানিয়ে পারছি না। বাঙ্গলার শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা অনেকেই পরিযায়ী সাংবাদিক। কিছু বাংলা সংবাদমাধ্যম আজকাল অফিস করছে নয়ডা, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, মুম্বইয়ে। ওঁদের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের থেকে ওখান থেকে চালালে বিজ্ঞাপন বেশি পাওয়া যায়। বাঙ্গলায় পাঠক থাকলেও বাজার নেই। দিদি, আমার চিন্তা হচ্ছে, কোনোদিন দেখবেন, পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যশালী কোনও সংবাদমাধ্যমের হেড অফিস হয়ে গিয়েছে গুজরাটে। আজকাল ইন্টারনেটের যুগে তো সবই সম্ভব। আর সেটা হলে বিজেপি আবার প্রচারে নামবে।

আমি কেন ভয় পাচ্ছি জানেন দিদি! আসলে আপনার কাগজ বলে পরিচিত কয়েক জায়গায় ক'দিন আগেও দেখতাম খুললেই আপনার ছবি দেওয়া বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন। সেগুলো দেখছি সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন যদি অন্য রাজ্য বিজ্ঞাপনের লোভ দেখায় তবে তো তারা চলেও যেতে পারে। তাই দিদি, ভয় পাচ্ছি। আপনি অবশ্য এগুলো ভালো বুঝবেন। আপনি ঠিক ম্যানেজ করে, চাপ দিয়ে আবার বশংবদ বানিয়ে ফেলবেন। আবার বিজ্ঞাপন এবং আপনার কথা মতো চলা।

অতিথি কলম

করণ ভাসিন

ভারতে জ্বালানি তেলের দাম কি সত্যিই সাধারণ দেশবাসীকে নাস্তানাবুদ করছে?

উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলির সঙ্গে ভারতে তেলের ওপর করের হার সমান আর উন্নত দেশগুলির থেকে তা অনেক কম। দিল্লিতে আজকের তারিখে মোট কর অর্থাৎ ভ্যাট ও এক্সাইজ ডিউটি নিয়ে হার ৪১ শতাংশ খুচরো পেট্রোলের ক্ষেত্রে আর ডিজেলের ক্ষেত্রে এই হার ৩৫ শতাংশ। অন্যদিকে ফ্রান্স এই হার পেট্রোল ৭৫ শতাংশ ও ৫৯ শতাংশ ডিজেলের ক্ষেত্রে।

এক কথায় বললে বলতে হবে, না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তেলের খুচরো দামের ওপর সরকারি কর ভারতের চেয়েও যথেষ্ট বেশি। কিন্তু ভারতের তুলনামূলক মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক একই মাত্রায় না হওয়ায় বর্ধিত দাম সাধারণভাবে মানুষের ওপর বাড়তি বোঝা হিসেবেই চাপ সৃষ্টি করে। বহু ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে এটিকে বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের ইস্যু করে তোলারও সঙ্গত চেষ্টা হয় যা খুব সহজেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে ভারতের মানুষের সামগ্রিক আয়ের অর্থাৎ প্রাত্যহিক আয়ের যে অংশ এই জ্বালানি তেলের পেছনে খরচ হয় সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের মাথাপিছু খরচের হিসেবে তা মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংস্থাগুলির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি বহুমুখী তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এই সুবাদে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিশ্ব তেল বাজারে জ্বালানি তেলের দামে হঠাৎ নতুন বৃদ্ধি যা ক্রমবর্ধমান তা নিয়ে ভারতে শোরগোল পড়ে গেছে। ভারতের তেলের দাম অন্য দেশের থেকে বেশি এটাই জনমনে বিশেষভাবে বদ্ধমূল হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা বিশ্বের পরিমাণগত ভাবে সর্বাধিক তেল আমদানিকারক দেশগুলি যেমন হল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স, সাউথ কোরিয়া বা জাপানের কথা ধরি, সেখানে তুলনায় পেট্রোল বা ডিজেল দু'টির দামই খুচরো বাজারে ভারতের থেকে বেশি। এই সব দেশের বিশেষ করে জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো বড়ো মাপের অর্থনীতির তুলনাতেও ভারতে তেলের দাম কম। শুধু তাই নয় বিআরআইসিএস অন্তর্গত দেশগুলি যার মধ্যে চীন ও রাশিয়াও রয়েছে তাদের থেকেও আমাদের দেশে তেলের দাম কম। মনে রাখা দরকার এর মধ্যে রাশিয়া আবার তেলের অন্যতম রপ্তানিকারক দেশ হলেও সেখানকার অন্তর্দেশীয় বাজারে অর্থাৎ দেশের মানুষের কাছে ভারতের চেয়ে তেলের বেশি দাম নেওয়া হয়। এই সূত্রে এশীয় দেশগুলির মধ্যে বহাল থাকা তেলের দামের তুলনাতেও ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম কম। এবং অবশ্যই এশীয় দেশগুলির মধ্যে ভারতে তেলের দাম কোনো অবস্থাতেই সর্বোচ্চ হয়নি। এক কথায় এই তথ্য অনুযায়ী বলা যায় যে বিশ্বের অন্যান্য বহু অর্থনীতির তুলনায় ভারতে জ্বালানি তেলের দাম এখনও কম।

কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ একটি বহুদেশীয় ক্রয় ক্ষমতা ভিত্তিক নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের প্রতি লিটারে দাম ভারতে সর্বাধিক। তাঁরা এই সমীক্ষা উন্নত ও উন্নয়নশীল সব রকমের দেশের মধ্যেই চালিয়েছিলেন। পিপিপি-র সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাটি হলো একটি দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রচলিত টাকা দিয়ে বিশ্বের যে কোনো অঞ্চল থেকে একই জিনিস কতটা কেনা সম্ভব (পরিমাণগত ভাবে)। এই পিপিপি পদ্ধতিটি বিশ্বের মানুষের আয়ের ভিত্তিতে ক্রয় ক্ষমতা নির্ধারণে সুবিধেজনক হলেও এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশ্বের

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দামের প্রতিতুলনা

জ্বালানি বাবদ কত আয়ে কত ব্যয়	
পেট্রোল	
দেশের নাম (শতাংশের	পেট্রোল খাতে প্রতিদিনের আয়ের নিরিখে প্রতিদিনের ব্যয় হিসেবে)
বাংলাদেশ	০.১০
ফ্রান্স	০.৮০
ইউ কে	০.৯৭
জার্মানি	১.৫২
ভারত	১.৮২
নেপাল	২.১৬
ভুটান	২.৩৪
ব্রাজিল	২.৫২
ইউএসএ	২.৬৮
পাকিস্তান	৩.৮৯

ডিজেল	
দেশের নাম (শতাংশের	ডিজেল খাতে প্রতিদিনের আয়ের নিরিখে প্রতিদিনের ব্যয় হিসেবে)
জাপান	১.১৪
ইউএসএ	১.৩৯
চীন	১.৬৫
ভারত	৪.৩৩
ব্রাজিল	৫.৩৩

জ্বালানির খুচরো দামে কত ট্যাক্স পেট্রোল (২০২১) লিটার/ইউএস ডলার			
পেট্রোল			
দেশের নাম	ভ্যাট আবগারি শুল্ক	খুচরো দাম	খুচরো মূল্যে কত ট্যাক্স (শতাংশে)
ফ্রান্স	১.২৫	১.৭৯	৬৯.৯
জার্মানি	১.২৫	১.৭৯	৬৯.৯
সুইডেন	১.১৪	১.৮৩	৬২.৫
ব্রাজিল	০.৯৪	১.৫৪	৬১.০
চীন	০.৪৪	০.৯৯	৪৪.৩
ভারত	০.৫৭	১.৩৯	৪১.০
তাইওয়ান	০.৩০	০.৮৫	৩৫.৫

ডিজেল (২০২১) লিটার/ইউএস ডলার			
দেশের নাম	ভ্যাট আবগারি শুল্ক	খুচরো দাম	খুচরো মূল্যে কত ট্যাক্স (শতাংশে)
সুইডেন	১.১৯	১.৮৭	৬৩.৮
ফ্রান্স	০.৯৬	১.৬৪	৫৮.৭
জার্মানি	০.৮৮	১.৫৬	৫৬.৫
ভারত	০.৪৫	১.২৭	৩৫.৪
ব্রাজিল	০.৩৫	১.০১	৩৫.২
চীন	০.২১	০.৮৯	২৪.১
তাইওয়ান	০.১৩	০.৮১	১৬.৩

সূত্র : আইএমএফ এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক

বিভিন্ন দেশে একটি বস্তুর দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুব একটা কাজে দেয় না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যদি আমরা পিপিপি পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্বের নানা দেশের দৈনিক মাথা পিছু আয়ের ভিত্তিতে কতটা তেল কিনতে পারছে বা ক্ষমতা রয়েছে তা বুঝতে চাই তাহলে ফল কিন্তু হবে মারাত্মক। শুধু কম কিনছে মানেই তাদের মূল্যমান অনুযায়ী তেল ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে বিষয়টা সত্য হলেও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আদৌ সহায়ক নয়। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু তেলের ব্যবহারের পরিমাণের প্রশ্নটি। প্রতিদিনের মাথাপিছু আয়কে তুলনা করতে হবে প্রতিদিনের মাথাপিছু খরচের সঙ্গে অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর দামের সঙ্গে নয়। এখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আয়ের কী পরিমাণ অংশ কী বস্তু কিনতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে উন্নত অর্থনীতির দেশগুলির মানুষের মাথাপিছু আয় যেহেতু বেশি তারা শতকরা যে পরিমাণ অর্থ তেল কিনতে ব্যবহার করবে (পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি) তা কম আয়ের ভারতের সঙ্গে তুলনায়

অর্থগতভাবে কম হবে (২০০ টাকা আয় হলে ২০ টাকার অনায়াসে কিনবে, ১০০ টাকা ২০ টাকা খরচ করতে হাঁফ ছুটে যাবে)। এছাড়া তেল সমৃদ্ধ দেশ বা তেল রপ্তানি করে এমন দেশের মানুষের পক্ষে বাড়তি তেল খরচ করা সহজ।

এখানে আমরা জানি কি যে গড়পড়তা একজন ভারতীয় দৈনিক ১ লিটার পেট্রোল বা ডিজেলও খরচ করে না! এর ফলে এক দিনের মোট খরচে তেলজনিত খরচের অনুপাত মোটেই খুব বেশি নয়। একটা মোটা দাগের হিসেবে পেট্রোল ডিজেল খাতে দৈনিক আয়ের কত শতাংশ খরচ হচ্ছে পিপিপি মডেল অনুযায়ী তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী একটি সমীক্ষা চালানো হয়। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান ছিল এর ভিত্তি। দু' ধরনের সমীক্ষাতেই ভারত মাঝামাঝি স্তরে রয়েছে।

অবশ্যই পেট্রোল ডিজেলের ক্ষেত্রে দৈনিক আয়ের শতকরা অংশ হিসেবে ভারত কখনই উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু পরিমাণকে ছাড়াতে পারবে না তবে একেবারে নীচেও থাকবে না। এক্ষেত্রে এলপিজি-র পরিসংখ্যান পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেখানেও বড়ো ধরনের হেরফের হবে না।

এছাড়া এটাও লক্ষ্য করা দরকার যে উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলির সঙ্গে ভারতে তেলের ওপর করের হার সমান আর উন্নত দেশগুলির থেকে তা অনেক কম। দিল্লিতে আজকের তারিখে মোট কর অর্থাৎ ভ্যাট ও এক্সাইজ ডিউটি নিয়ে হার ৪১ শতাংশ খুচরো পেট্রোলের ক্ষেত্রে আর ডিজেলের ক্ষেত্রে এই হার ৩৫ শতাংশ। অন্যদিকে ফ্রান্স এই হার পেট্রোল ৭৫ শতাংশ ও ৫৯ শতাংশ ডিজেলের ক্ষেত্রে। পরিসংখ্যানটি ২০২১ সালের। সুইডেন ও জার্মানিতেও খুচরো তেলের ওপর কর ভারতের চেয়ে বেশি।

পিপিপি-র জটিল হিসেব ছাড়াও ২০২২ সালের মার্চ মাসে ভারতের জিডিপি হয়েছে ২৩২ লক্ষ কোটি টাকা আর লোকসংখ্যা ধরা হয়েছে ১৩৮ কোটি টাকা। এই হিসেব অনুযায়ী বছরে মাথাপিছু আয় ১.৬৮ লক্ষ টাকা। এর মানে মাথাপিছু মাসিক আয় ১৪ হাজার টাকা। অর্থাৎ দৈনিক আয় ৪৬৬ টাকা। এখন পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ১১০ আর ১০০ টাকার আশেপাশে। অর্থাৎ এগুলি আমাদের দৈনিক গড় আয়ের ২৪ ও ২২ শতাংশ। কিন্তু মনে রাখবেন আগে বলা তথ্য অনুযায়ী আমাদের মাথাপিছু দৈনিক জ্বালানি খরচ ১ লিটারের বেশ নীচে।

এই বিশ্লেষণটি কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো পরিতৃপ্তির ভাব তৈরির জন্য নয়। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্বের সমস্ত দেশের পক্ষেই বিপদ ডেকে এনেছে অবশ্যই ভারতকে বাদ দিয়ে নয়। দেশের অর্থনীতির ফান্ডামেন্টাল ধাঁচটিকে অটুট রাখার জন্য সরকার স্বল্প ও দীর্ঘ দুটি মেয়াদেরই উপযুক্ত পরিকল্পনা নিতে পারে।

(লেখক নিউ ইয়র্কস্থিত অর্থনীতিবিদ)

স্মরণ সভা

অধ্যাপক ও হিন্দু জাতীয়তার প্রসারে অন্যতম সৈনিক গোপাল চন্দ্র ঘোষ ১৯ মে, ২০২১-এ প্রয়াত হলেও অতিমারীর কারণে গত ১০ এপ্রিল কলকাতার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মঞ্চে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর মাতামহ প্রয়াত অমূল্য রতন ঘোষ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সহপাঠী ছিলেন। ডাঃ হেডগেওয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে তিনি এক নিবন্ধ লেখেন যা 'মর্ডান রিভিউ' (১৯৪০)-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বেঙ্গল ভলাটিয়ার্স ট্রাস্ট ও সিটি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত এই স্মরণসভায় তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক বন্ধু ও ছাত্র-ছাত্রীরা স্মৃতিচারণা করেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক, বর্তমানে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত গ্রাম সমিতির সদস্য জয়দেব দাসের মাতৃদেবী নীহারবালা দাস গত ১৮ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৭ পুত্রের জননী হলেও বর্তমানে ৫ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মঙ্গলনিধি

গত ১৬ মার্চ হাওড়ার শিবপুর নিবাসী স্বস্তিকার প্রবীণ লেখক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার উন্নতিকল্পে মঙ্গলনিধি দান করেছেন।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

অতি দর্পে হতা লঙ্কা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আজ যদি রতন সেন জীবিত থাকতেন তবে কি তিনি পদ্মিনীর খোঁজে যেতেন? যদি আজকে পদ্মিনী চিত্তৌর আসতেন তাহলে কি তার পোষ্য টিয়া হিরামন দিনরাত তাঁর রূপের ফিরিস্তি দিত? বোধহয় না। আজকে থাকলে হিরামন যন্ত্রণা নিয়ে বলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক উন্নত দ্বীপরাষ্ট্র শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত, ক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি, গোষ্ঠীতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র আর দুর্নীতির জাঁতাকলে কেমন ভাবে বিপর্যস্ত। এ কেমন দেশ শ্রীলঙ্কা যেখানে প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী সবাই এক পরিবারের। পার্লামেন্টেরও অনেক সদস্য সেই পরিবারেরই। নীতিগত পদক্ষেপ ব্যতিরেকেই তারা ঋণের মাধ্যমে সমাধান চেয়েছে। এ তো ভারী অবাক করা বিষয়, বড়ো বড়ো পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে কিন্তু যাচাই-বাছাই পরিকল্পনা নেই! একটার পর একটা বৃহৎ প্রকল্প শ্বেতহস্তিতে পরিণত। পরিকাঠামোর অবৈজ্ঞানিক উন্নতি করতে গিয়ে তারা মূলধারার যে অর্থনীতি অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যয় সংকোচন করেছে। ঋণের সুদ শোধ তো দূরের কথা, রপ্তানিটাও বহুমুখী করার কথা ভাবেনি। শ্রীলঙ্কার ফরেন কারেন্সি রিজার্ভ তলানিতে উপনীত, ফলে প্রয়োজনীয় জ্বালানিটুকুও আমদানি করতে হিমশিম খাচ্ছে। দিনে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎশূন্য একটা ভদ্র দেশ। বর্তমান জাতীয় জরুরি অবস্থার কারণ অনুসন্ধানের অনেকগুলি দিক আছে। ২০১৯ সালে এই শ্রীলঙ্কা উচ্চমাধ্যম আয়ের দেশ থেকে নিম্নমাধ্যমে নিক্ষিপ্ত হয়। সে বছর, এপ্রিলে ইস্টার্ন সানডে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬৯ জন নিহত হলে— পর্যটনশিল্পে ধ্বস নামে। তার পরেই করোনা অতিমারীর অভিশম্পাতে ৮০ শতাংশ হারে পর্যটক কমলে ফরেন কারেন্সি রিজার্ভে বিপুল টান আসে। এই ক্ষেত্র বাৎসরিক ৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে (জিডিপির ৪.৯ শতাংশ) এক ধাক্কায় কমে গিয়ে হয় ৬৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (জিডিপির ০.৮২ শতাংশ)।

এরই মধ্যে ২০১৯-এর নভেম্বরের পার্লামেন্টারি নির্বাচনে গোতাবায়া রাজাপক্ষ ক্ষমতায় আসেন যিনি তামিল টাইগারের

মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির সঙ্গে একটা সময় লড়াই করেছিলেন এবং মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি অত্যন্ত অবিবেচকের ভূমিকায়, সিংহাসনে বসেই তিনি জনতাকে হালকা করের স্বাদ দিতে উঠেপড়ে লাগলেন। রাতারাতি জিএসটি ১৫ শতাংশ থেকে হয়ে গেল ৮ শতাংশ। শুধু তাই না, ২ শতাংশ ন্যাশনাল বিল্ডিং ট্যাক্স খাতা থেকেই মুছে গেল। এই বিপুল ভরতুকি দিতে গিয়ে রাজকোষে পিপীলিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একে তো করোনার সময় রিয়েল জিডিপি ৩.৬ শতাংশ সংকুচিত এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষে রাজস্ব ঘাটতি হয়। ১০ শতাংশ, তার পালটা প্রতিক্রিয়ায় রাজাপক্ষ আরও এক তুঘলকিপনা করে বসেন, সার আমদানি পুরোপুরি বন্ধ রেখে রাতারাতি একটা দেশ খাতায় কলমে নিয়মে হয়ে গেল জৈব কৃষির দেশ। হু হু করে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন তলানিতে, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া।

গত ১৫ বছর যাবৎ শ্রীলঙ্কা সরকার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা যাচাই না করেই সোভিনিয়ার বন্ড নিয়ে গেছে। এই পদ্ধতি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এক্ষেত্রে ম্যাচুইরিটি পিরিয়ড সংক্ষিপ্ত হয় এবং সুদের মাত্রাও বিপুল। আজকের শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি দেখছিতো আমরা, যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আছে তা দিয়ে ১০ দিনেরও আমদানি মূল্য পরিশোধ করার অবস্থায় নেই একটা দেশ। এতো শোচনীয় পরিস্থিতি যেখানে হাসপাতালে পর্যন্ত জরুরি পরিষেবা বন্ধ। এই অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন সোভিনিয়ার বন্ডের অত্যাচারে ২০১৯-এর বাণিজ্যিক ঋণ মোট বৈদেশিক ঋণের ৫৭ শতাংশে উপনীত হয়, যা ২০০৪-এও মোট বৈদেশিক ঋণের ২.৫ শতাংশ ছিল। একটা ম্যানমেড ডেনজার এটাকে বলা যেতেই পারে। এইসব জটিল যৌগিক সমস্যার ফলে শ্রীলঙ্কার ক্রেডিট রেটিং কোনো অঙ্কের হিসেবেই দাঁড়াচ্ছে না। ফরেন রিজার্ভের উপর তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে শ্রীলঙ্কা। যা ২০১৯-এর জুনে ছিল ৮.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার তা এই বছর জানুয়ারিতে কমে হয়েছে ২.৪ বিলিয়ান মার্কিন ডলার। শ্রীলঙ্কার সংকটের পেছনে আরও বড়ো যে কারণ তা অবশ্যই বিদেশ

ফঃ ২

থেকে ঋণ গ্রহণ।

শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে চীনের অর্থনৈতিক উপনিবেশ ছাড়া আর কি কিছু? চীনের ঋণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভূরাজনৈতিক হিসেবের সঙ্গে সম্পর্কিত। এমন সব প্রকল্পে তারা অর্থসহায়তা করেছে যাতে ঋণগ্রহীতা দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কার অদক্ষতা প্রতিষ্ঠিত এবং মূলধারার অর্থনীতির সঙ্গে যারা কোনো সম্পর্ক নেই। চীনের অর্থায়নে শ্রীলঙ্কায় ১২ বিলিয়ান মার্কিন ডলার ব্যয়ে যে বন্দর এবং আনুষঙ্গিক আধুনিকতা নির্মাণ হয়েছে তা দেখতে জমকালো কিন্তু শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে লাভ রাখেনি বরং চীন উপকৃত। ঋণগ্রহীতা দেশ হিসেবে শ্রীলঙ্কার স্বজনতোষী চরিত্র স্পষ্ট। এমনই সব পরিকাঠামো (হামবানটোটা পোর্ট, লোটাস টাওয়ার) চীনের ঋণে নির্মিত যা থেকে ঋণী দেশ রাজস্ব বৃদ্ধি করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ, উলটে বন্দরটিই চীনের কাছে লিজ দিতে বাধ্য হয় শ্রীলঙ্কা। ওই পোর্টে চীন ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে, কিন্তু পরিশোধের ক্ষমতা কোথায় শ্রীলঙ্কার। ফলস্বরূপ যে বন্দরে ২০১২ পর্যন্ত মাত্র ৩৪টি বাণিজ্যিক জাহাজ ঠাঁই পেত সেই বন্দর আজ ৩৬ হাজার জাহাজের ঠিকানা, ৪৫০০ তেল ট্যাঙ্কারের মজুতঘর। এরচেয়ে ট্রাজেডির আর কী হতে পারে, ঋণ পরিশোধে চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়ায় শ্রীলঙ্কারই মাটি ব্যবহার করে ফায়দা তুলছে চীন। ঋণের সুদ বাবদ পোর্ট সংলগ্ন ১৫০০ একর জমিও এখন চীনের কবজায়। এই চিনচিনে ব্যথাও শ্রীলঙ্কার দুর্ভোগের অন্যতম কারণ। ২০১২ থেকে ২০১৮-র মধ্যে চীনের কাছে শ্রীলঙ্কার ঋণ ২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫ বিলিয়ন।

আজকের হিসেব জানলে চোখে সর্ষেফুল দেখতে হবে। শ্রীলঙ্কার ঋণ জিডিপির ১১৯ শতাংশ! এও কি হয়? এটাই ঘটেছে এবং এই ঋণের ৬৪ শতাংশ অন্যান্য বহির্দেশের, ১০ শতাংশ চীনের। চীনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার মানে হাড়িকাঠে মাথা দেওয়া, কারণ একমাত্র চীনের সঙ্গেই non concessional commercial loan, যার সুদের হার ৬.৫ শতাংশ যেখানে অন্য দেশের সুদের হার ২.৫ শতাংশ। ২০২১ অর্থবর্ষে শ্রীলঙ্কা প্রত্যক্ষ করল তাদের ঋণবাবদই যে পরিমাণ সুদ গুনতে হবে তা তাদের মোট রাজস্বের ৯৫ শতাংশ। একদিকে ঋণের ভারে টলমল, অন্যদিকে দুর্বল কর ব্যবস্থা, যার ৫০ শতাংশই আসত আমদানি শুল্কের উপর ভর করে, যা করোনাতে মুখথুবড়ে পড়েছে। তার উপর পূর্বে আলোচিত আচমকা গণকরমুক্তি একটা রাষ্ট্রকে তার কর এবং জিডিপির অনুপাত ২০২০-তে ৮.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছে যা ২০১৬-তেও ছিল ১৪ শতাংশ। খাঁ খাঁ রাজকোষ, ফরেন রিজার্ভে করাল ছায়া, বিপুল ঋণের বোঝা, চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতি মানুষকে ভোর চারটের সময় পেট্রোল পাম্পে লাইনে দাঁড় করিয়েছে। মানুষ পালিয়ে বাঁচতে তামিলনাড়ুর দিকে জাহাজের কম্পাস ঘুরিয়েছে। ২০২২-এ শ্রীলঙ্কার রিটেল ইনফ্লেশান রেট ৫ শতাংশের সীমারেখা অতিক্রম করে ১৮.৭ শতাংশে কাতরাচ্ছে। খাদ্যমূল্যে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি, এক কাপ চা ১০০ শ্রীলঙ্কান রুপি যা কিনা স্বাভাবিকের থেকে ৫ গুণ বেশি। দিশেহারা মানুষ কী করে কিনবে ৫০০ টাকা কিলো দরে চাল বা ৮০০ টাকার দুধ। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিজিট ২০২০-তে জিডিপির ১.৩ শতাংশ ছিল যা আজকে ৩.৮ শতাংশ। ভারত ইতিমধ্যেই ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে কিন্তু এ দিয়ে তো লঙ্কার তেজ ফিরবে না! লঙ্কা আক্ষরিক অর্থেই জ্বলছে।

ছারখার শাসকদল। দেশের শাসকদল শ্রীলঙ্কা পিপলস ফ্রিডম অ্যালায়েন্সের নেতা তথা মন্ত্রী উদয় গাম্মনপিলা রাজাপক্ষ ভাইদের বিরুদ্ধে সরব। প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ার ইস্তফা এবং আর্থিক সংকট মোকাবিলায় জাতীয় সরকার গড়ার দাবি উঠছে। অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত বাসিল। দায়িত্ব দেওয়া হয় সাব্রেকে কিন্তু তিনি অরাজি। তিনিই বলেন এই সংকট থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব না। যখন নিবন্ধ লিখছি তখন, রাজাপক্ষর সরকার সংখ্যা গরিষ্ঠতা হারিয়েছে। সোমালিয়ার মুদ্রাস্ফীতি, তানজনিয়ার অরাজকতা, ভেনেজুয়েলার বিক্ষোভ, গ্রিসের চরম অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হলো শ্রীলঙ্কার সংকট। একটা দ্বীপে নাগরিকদের এখন কোনো তফাত নেই, না অর্থনৈতিক না সামাজিক। সবাই অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। নতুন সরকার চায়। ওরা লড়াই করতে জানে, তিরিশ বছর তামিল টাইগারের সঙ্গে পাঞ্জা পড়েছে। লঙ্কার রবি যেন অস্তাচলে না যায়। রাবণ তো বলেছিলেন— করিতে উত্তম কার্য বাঞ্ছা যদি হবে; আসল্য ত্যাজিয়া তাহা তখনই করিবে।

লঙ্কা কি পাপীর দুঃখ শমনের হাতে ঘুচাতে পারবে না?

(লেখক বিশিষ্ট গবেষক ও রাজনৈতিক নিবন্ধকার)

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে রাশিয়ানরাই ছিলেন ব্রাত্য

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

ভূমিকা : এর আগের এক নিবন্ধে জানিয়েছিলাম যে রাশিয়ায় তথাকথিত কমিউনিস্ট বিপ্লব কোনো স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন ছিল না। জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম লেনিনকে শুধু অর্থ সাহায্য নয় সব রকম লজিস্টিক সমর্থন জুগিয়েছিল। লেনিনকে বিশেষ ট্রেনে বার্লিন থেকে পেট্রোগ্রাডে পাঠিয়েছিল এবং ৫৮২০ লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য দিয়েছিল। বলশেভিক পার্টির নেতৃস্থানীয়রা ছিল ইহুদি। তারাই জার নিকোলাসকে খুন করে। এবার আমরা দেখাব কীভাবে পশ্চিমি বিশ্ববাদীরা নিশ্চিত করেছিল যেন অরাশিয়ানরা রাশিয়া শাসন করে।

লেনিন : তাঁর প্রপিতামহ পর্যন্ত পৌঁছলে তাঁর মধ্যে রাশিয়ান, ইহুদি, সুইডিশ, জার্মান ও কাল্মিক প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। তাঁর পিতা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ ছিলেন প্রাক্তন দাসদের (সার্ফ) পরিবারের; ইলিয়ার বাবার জাতিসত্তা অস্পষ্ট, আর ইলিয়ার মা আন্না আলেক্সিয়েভনা স্মিরনোভা ছিলেন অর্ধেক কাল্মিক এবং অর্ধেক- রাশিয়ান। নিম্নশ্রেণীর পটভূমি থাকা সত্ত্বেও ইলিয়া মধ্যবিত্তের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। কাজান ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে পদার্থবিদ্যা এবং গণিত অধ্যয়ন করার পরে পেনজা ইন্সটিটিউট ফর দ্য নোবিলিটি-তে অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি ইলিয়া বিয়ে করেন মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ব্ল্যাঙ্ককে। মারিয়া ছিলেন একজন সুশিক্ষিত ধনী জার্মান-সুইডিশ লুথেরান মায়ের কন্যা এবং একজন রাশিয়ান ইহুদি পিতা যিনি খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং একজন চিকিৎসক ছিলেন। লেনিনের বোন আনা এ কথা জানিয়েছেন।

লিওন ট্রটস্কি : ১৮৭৯ সালে ৭ নভেম্বর ইয়াভকাতে ইউক্রেনীয় ইহুদি ধনী কৃষক পরিবারের ডেভিড লিওন্টিভিচ ব্রনস্টেইন এবং আনা লভোভনার পঞ্চম সন্তান লেভ ডেভিডোভিচ ব্রনস্টেইন (ইনিই ট্রটস্কি নামে পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন) জন্মগ্রহণ করেন। রাশিয়ান সাম্রাজ্যের খেরসন গভর্নরেট, বর্তমানে ইউক্রেনের বেরেসলাভকার নিকটতম পোস্ট অফিস থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরে একটি ছোট্ট গ্রাম এই ইয়াভকা। তাঁর বাবা ডেভিড লিওন্টিভিচ পোলতাভাতে থাকতেন এবং পরে বেরেসলাভকাতে চলে আসেন। কারণ সেখানে একটি বিশাল ইহুদি সম্প্রদায় বাস করত। বাড়িতে মুখের ভাষা ছিল রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় ভাষার মিশ্রণ (সুরজিক নামে পরিচিত)। কিছু লেখক, বিশেষ করে রবার্ট সার্ভিস দাবি করেছেন যে ট্রটস্কির শৈশবের প্রথম নাম ছিল ইদ্দিশ লেইবা। আমেরিকান ট্রটস্কি বিশেষজ্ঞ ডেভিড নর্থ বলেছেন যে ট্রটস্কির ইহুদি জন্মের উপর ভিত্তি করে এই অনুমান করা হয়েছে।

স্ট্যালিন : স্ট্যালিনের জন্ম ১৮৭৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর, জর্জিয়ান শহর গোরিতে। জায়গাটা ছিল রাশিয়ান সাম্রাজ্যের ট্রিফ্লিস গভর্নরেটের অংশ। তাঁর নাম ছিল ইওসেব বেসারিওনিস ডিজে জুগাশভিলি। তাঁর পরিবার ছিল জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান, রাশিয়ান এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের মিশ্রণের বাড়ি। ২৯ ডিসেম্বর খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বেসারিয়ন জুগাশভিলি এবং মা একাতেরিন গেলাদজে জাতিগতভাবে জর্জিয়ান ছিলেন। স্ট্যালিন জর্জিয়ান ভাষাতেই কথা বলতেন।

শৈশবকাল থেকে তিনি তাদের একমাত্র জীবিত সন্তান ছিলেন। তাঁর ডাকনাম ছিল 'সোসো', 'আইওসেব'-এর ছোটো আকার।

বাবা বেসারিয়ন ছিলেন একজন জুতা প্রস্তুতকারক। তিনি অন্য একজন মালিকের অধীনে একটা কারখানায় কাজ করতেন। প্রথম দিকে আর্থিক সাফল্য ছিল কিন্তু পরে অনটনের মধ্যে পড়তে হয়েছিল এবং পরিবারটিকে দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। বেসারিয়ন মদ্যপ হয়ে ওঠেন। মাতাল অবস্থায় তিনি স্ত্রী ও ছেলেকে মারধর করতেন।

তিনজন সোভিয়েত জেনারেল সেক্রেটারি ইউক্রেনে জন্মগ্রহণ করেছেন বা বেড়ে উঠেছেন, নিকিতা ক্রুশ্চেভ, লিওনিড ব্রেজনেভ এবং কনস্ট্যান্টিন চেরনেনকো।

ক্রুশ্চেভ : ১৮৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল, বর্তমান ইউক্রেনীয় সীমান্তের কাছে বর্তমানে রাশিয়ার কুরস্ক ওব্লাস্টের একটি গ্রাম;, কালিনোভকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা, সের্গেই ক্রুশ্চেভ এবং কেসনিয়া ক্রুশ্চেভা ছিলেন রাশিয়ান বংশোদ্ভূত দরিদ্র কৃষক এবং নিকিতার দু' বছরের ছোটো বোন ইরিনা।

কিন্তু তাদের মধ্যে ইউক্রেনীয় সংস্কার ছিল।

ব্রেজনেভ : ১৯০৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর রাশিয়ান সাম্রাজ্যের ইয়েকাতেরিনোস্লাভ গভর্নরেটের অন্তর্গত কামেন্সকোয়ে (বর্তমানে কায়িনস্কে, ইউক্রেন)-তে ধাতুকর্মী ইলিয়া ইয়াকোলেভিচ ব্রেজনেভ এবং তার স্ত্রী নাটালিয়া ডেনিসোভনা মাজালোভার পুত্র ব্রেজনেভ জন্মগ্রহণ করেন। কামেনস্কোয়ে যাওয়ার আগে তার বাবা-মা ব্রেজনেভোতে (কুরস্কি জেলা, কুরস্ক ওব্লাস্ট, রাশিয়া) থাকতেন। কিছু নথিতে ব্রেজনেভের জাতিসত্তা ইউক্রেনীয় হিসাবে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে তার পাসপোর্ট। আবার অন্য কিছু নথিতে রাশিয়ান দেখানো হয়েছিল। ১৯১৭ সালের রাশিয়ান বিপ্লবের পরের বছরগুলিতে অনেক যুবকের মতো, তিনি প্রথমে ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং পরে ধাতুবিদ্যায় প্রযুক্তিগত শিক্ষা লাভ করেন।

চেরনেঙ্কো : চেরনেঙ্কো ১৯১১ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর সাইবেরিয়ার বলশায়া টেসের (বর্তমানে নোভোসিলোভস্কি জেলা, ক্রাসনেমায়ার্স্ক ক্রাই) এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা, উস্টিন ডেমিডোভিচ (ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত), তামার খনি এবং সোনার খনিতে কাজ করতেন এবং তার মা খামারের কাজ দেখাশোনা করতেন।

গর্বাচেভ : গর্বাচেভ ১৯৩১ সালে ২ মার্চ তখনকার রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটিভ সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকের প্রিভোলনয়ে স্টাভরপোল ক্রাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময়ে, প্রিভোলনয়ে রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয়দের মধ্যে প্রায় সমানভাবে বিভক্ত ছিল। গর্বাচেভের পৈতৃক পরিবার ছিল জাতিগত ভাবে রাশিয়ান এবং কয়েক প্রজন্ম আগে ভোরোনেজ থেকে এই অঞ্চলে চলে এসেছিল, তার মাতৃ পরিবার জাতিগত ইউক্রেনীয় ঐতিহ্যের ছিল এবং চেরনিহিভ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

আন্দ্রোপভ : আন্দ্রোপভের পারিবারিক পটভূমি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, আন্দ্রোপভ ১৯১৪ সালে ১৫ জুন স্তানিৎসা নাগুতস্কায় (রাশিয়ার আধুনিক স্টাভ্রোপল ক্রাই) জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ভ্লাদিমির কনস্টান্টিনোভিচ আন্দোপভ, ডন কস্যাক বংশোদ্ভূত একজন রেলকর্মী ছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালে টাইফাসে মারা যান। তাঁর মা, ইয়েভজেনিয়া কার্লোভনা ফ্লেকেনস্টাইন তাকে দত্তক নেন এবং বড়ো করেন।

ম্যালেনকভ : ম্যালেনকভ রাশিয়ান সাম্রাজ্যের ওরেনবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষরা ১৮ শতকে অটোমন রুমেলিয়া এয়ালেট (বর্তমান উত্তর মেসিডোনিয়া) এর ওহরিড এলাকা থেকে অভিবাসন করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাশিয়ান ইম্পেরিয়াল আর্মিতে অফিসার হিসেবে কাজ করেছিল। ম্যালেনকভ রাশিয়ান। বোধ হয় সেই কারণে তাঁকে অস্থায়ীভাবে প্রধান পদে রাখা হয়েছিল এবং এক বছরের মধ্যে সরানো হয় জোর করে।

পুতিন : পুতিন ১৯৫২ সালে ৭ অক্টোবর লেনিনগ্রাদে (বর্তমানে সেন্ট পিটার্সবার্গ) জন্মগ্রহণ করেন। ভ্লাদিমির স্পিরিডোনোভিচ পুতিন ও মারিয়া ইভানোভনা পুতিনার তিন সন্তানের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ছোটো। তাঁর ঠাকুর্দা স্পিরিডন পুতিন, ভ্লাদিমির লেনিন এবং জোসেফ স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত রাঁধুনি ছিলেন। পুতিনের জন্ম হয়েছিল দুই ভাইয়ের মৃত্যুর পরে। তিনি হলেন প্রথম খাঁটি রুশ যিনি প্রায় ২০ বছরের বেশি প্রধান পদে আছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে,

১। সোভিয়েত রাশিয়া ১৯১৭ থেকে১৯৯১ এই ৭৫ বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। বিপ্লবের মাধ্যমে জারতন্ত্র রাশিয়ার পতন ঘটানোর জন্য কাইজারের জার্মান সরকার নির্বাসন থেকে লেনিনকে নিয়ে আসে।

২। বলশেভিকরা প্রধানত ইহুদি 'বিপ্লবীদের' নেতৃত্বে রাশিয়ান জার পরিবারকে হত্যা করে।

৩। বলশেভিকদের অর্থায়ন করা হয়েছিল নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কার, মার্কিন সরকার, রকফেলার এবং রথচাইল্ডসদের দ্বারা। যুক্তরাজ্যের রথসচাইল্ডরা ইহুদি প্রধান বলশেভিকদের আদেশ দিয়েছিল রাশিয়ান জারদের উপর শেষ আঘাত আনার। অর্থাৎ

- একজন রুশ + ইহুদি + জার্মান + সুইডিশ ৭ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়া শাসন করেছে (লেনিন)।
- একজন জর্জিয়ান নেতা ২৯ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়া শাসন করেছেন (স্টালিন)।
- ইউক্রেনীয় নেতারা ৩০ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়া শাসন করেছেন (ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ, চেরনেঙ্কো)।
- একজন রাশিয়ান + ইউক্রেনীয় সোভিয়েত রাশিয়া ৬ বছর শাসন করেছিলেন (গর্বাচেভ)।
- একজন কসাক ২ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়া শাসন করেছেন (অ্যান্দ্রোপভ)।
- একজন রাশিয়ান সোভিয়েত রাশিয়া শাসন করেছিলেন ১ বছর (মালেনকভ)।
- মোট সোভিয়েত নেতৃত্ব যুগের ৪০ শতাংশ ইউক্রেনীয়দের আধিপত্যে ছিল।
- মোট সোভিয়েত নেতৃত্ব যুগের ৩০ শতাংশ জর্জিয়ানদের আধিপত্য ছিল।
- ক্রুশ্চেভ, যিনি একজন ইউক্রেনীয় ছিলেন, ইউক্রেনকে ক্রিমিয়া 'দান' করেছিলেন।
- গর্বাচেভ যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংসের জন্য বিভ্রান্ত করেছিলেন অর্ধেক ইউক্রেনীয় ছিলেন।

চিন্তার বিষয় হলো,

১। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে এথনিক (জাতিগত) রাশিয়ানদের মানে রুশ জাতির মানুষদের অনুপস্থিতি দেখায় যে, তথাকথিত রাশিয়ান বিপ্লবের পরে বিশ্ববাদীরা মানে মূলত ইহুদি-অ্যাংলো-আমেরিকান গোষ্ঠী নিশ্চিত করেছিল যে অরাশিয়ান জাতিসত্তাগুলি সোভিয়েত রাশিয়াকে শাসন করবে এবং সঠিকভাবে রাশিয়ানদের নিশানা বানাবে।

২। ইউক্রেনীয়রা সোভিয়েত রাশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্বে আধিপত্য বিস্তার করেছে। হতে পারে উপরোক্ত পশ্চিমি বিশ্ববাদীরা রুশ জাতির লোকদের শাস্তি দিতে ও দমন করতে এই কাজ করেছিল।

৩। জর্জিয়ানরা রাশিয়ানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত রাশিয়া নেতৃত্ব দিয়েছে।

৪। জাতিগত ভাবে রাশিয়ানদের দাস হতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৫। পুতিনের ২০ বছরের অধিক নেতৃত্ব মানে একজন রাশিয়ান দ্বারা রুশ জাতির শাসন সভ্যতার সন্ধিক্ষণ হতে পারে।

৬। জুডিও-অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যের বিশ্ববাদীরা একটি স্লাভকে অন্য স্লাভের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে কেন্দ্রভূমি এবং তার চারপাশ পরিচালনা করার চেষ্টা করছে।

পূর্ব ইউরোপে স্লাভরা অতি প্রাচীন বহু-ঈশ্বরবাদী মূর্তিপূজক। তার মধ্যে রাশিয়ার গোটা অংশ, পূর্ব ইউরোপের সব দেশ পড়ে। স্লাভরা খ্রিস্টান ধর্ম পুরোপুরি মানেনি। লড়াই এখনো চলছে; তাই এক স্লাভকে আরেক স্লাভের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়েছে কারা? ▯

চব্বিশের পথ অনেকটাই মসৃণ করলো উত্তরপ্রদেশ

রঞ্জন কুমার দে

কৃষক আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো নির্বাচনী ইস্যু ফুৎকারে উড়িয়ে মোদী-যোগীর যুগলবন্দিতে বিজেপি আবার চালকের আসনে। ধারণা করা হচ্ছে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের সাফল্যের সৌজন্যে ২০২৪-এর লোকসভা বিজেপির অনুকূলে এবং যোগী আদিত্যনাথ অবশ্যই ভবিষ্যতের জন্য দিল্লির মসনদে নিজের দাবিদারি কিছুটা আগাম পোক্ত করে নিলেন। কংগ্রেস শাসিত পঞ্জাবকেও হারিয়ে গান্ধী পরিবারের নেতৃত্ব প্রশ্নচিহ্নে। মমতা ব্যানার্জির বাঙ্গলা জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর দাবিদারিতে কেজরিওয়ালের পঞ্জাব বিজয় অনেকটাই প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালো। মায়াবতীর বিএসপি অনেক আগেই ময়দান থেকে সরে আসছিল, কংগ্রেস নামমাত্র আসনেই সীমাবদ্ধ, তবে একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে সমাজবাদী পার্টি ১০ শতাংশ ভোটব্যাংক বাড়িয়ে গত নির্বাচন থেকে ৬৪টি আসন বেশি পেয়ে ১১১টি আসন ধরে রাখলো। মনে করা হচ্ছে, সংখ্যালঘু ভোট এককাট্টাভাবে সপাতে আসা এবং মায়াবতীর দুর্বলতায় সপা সামান্য লাভান্বিত হয়েছে। তবে যোগী আদিত্যনাথের কট্টর হিন্দুত্ব ও সুশাসন ফ্রন্টফুটে চলে আসায় উত্তরপ্রদেশে জাতপাতের কুৎসিত রাজনৈতিক সমীকরণের সমাপ্তি ঘটেছে।

২০১৮ সালে ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটকে কংগ্রেস বিপুল সাফল্যের সঙ্গে ক্ষমতায় আসতে পারায় অনুমান করা হয়েছিল, তাঁদের সূর্য আবার উদয় হচ্ছে কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী আরও বেশি শক্তি নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে সবচেয়ে বড়ো চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মুখ্য বিরোধী পার্টির তকমা কংগ্রেস হারিয়ে কি কার্যত আঞ্চলিক দল হয়ে উঠবে! বস্তুত, পঞ্জাবে পরাস্ত হয়ে ভারত কংগ্রেসশূন্য হবার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। বিশেষ করে বাম-কংগ্রেস ক্রমাগত বিজেপির ঘোর বিরোধিতা করে নিজেদের অস্তিত্ব চরম সংকটে ফেলেছে। সেখানে আম আদমি পার্টি প্রধান বিরোধীর ভূমিকায়। ১১৭ আসন বিশিষ্ট পঞ্জাব বিধানসভায় আপ ৯২টি আসন নিয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। বিজেপি সেখানে ১.২১ শতাংশ ভোট বাড়িয়ে ৬.৬ শতাংশে পৌঁছেছে। পঞ্জাবে কংগ্রেসের ঘরোয়া কোন্দল এবং দুর্বল নেতৃত্বে ৫৯টি আসন হারিয়ে এখন ১৮-এর কোঠায়। আপ পঞ্জাব দখলের সঙ্গে সঙ্গে গোয়াতেও ভালো ফলাফল করতে পেরেছে। প্রায় ৭ শতাংশ ভোট আপ ২টি আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ছিল কিন্তু কংগ্রেস প্রায় ৫ শতাংশ ভোটব্যাংক হারিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে ২.১৮ শতাংশ ভোটব্যাংক ঘাটতি হলেও ৪৭টি আসন নিয়ে গেরুয়াগড় অক্ষত রয়েছে। তবে কংগ্রেসের একমাত্র এই রাজ্যে ৪.৪২ শতাংশ ভোটব্যাংক বেড়েছে। একদা কংগ্রেসের গড় উত্তর-পূর্বের মণিপুর ২০১২ সালেও কংগ্রেস ৬০ সদস্যবিশিষ্ট এই বিধানসভায় ৪২টি আসনের সঙ্গে সর্বকালের সেরা প্রদর্শন করতে পেরেছিল। তখনও বিজেপি রাজ্যে শূন্যের কোঠায় ছিল কিন্তু ২০১৭ সালের ২১টি আসন নিয়ে গঠবন্ধন সরকারের পর এইবার গেরুয়া শিবির ৩২টি আসন নিয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় হাসিল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আর কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমতে কমতে পৌঁছেছে মাত্র পাঁচে।

অবশ্যই উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী জনমত সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দিল্লির রাইসিনা হিলস লক্ষ্ণৌ হয়েই যেতে হয়। গুজরাটের অপ্রতিরোধ্য দাপুটে নেতা তথা নরেন্দ্র মোদীও দিল্লি জয়ে উত্তর প্রদেশের

যোগী আদিত্যনাথকে প্রধানমন্ত্রীর মসনদ স্পর্শ করতে হলে নরেন্দ্র মোদীর মতো নিজেকে আরও সংশোধন করতে হবে— পরিবর্তন, হিন্দুত্ব এবং সবকা সাথ সবকা বিশ্বাসে জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে আশ্বস্ত করে চলতে হবে।

বারাণসী কেন্দ্রে আশ্রিত হয়েছেন। সাউথ ব্লকে যে ১৫ জন প্রধানমন্ত্রী শপথবাক্য পাঠ করেছেন তাঁদের মধ্যে ৯ জনই ভারতের সবচেয়ে বড়ো রাজ্য উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধি ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের আরেকটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে রাজ্যটি হিন্দি অধ্যুষিত হওয়ার সুবাদে প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের রাজনীতিতে উত্তরপ্রদেশের জনমত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাব ফেলে। ২০১৪, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে ও উত্তরপ্রদেশের ভালো প্রদর্শনকারী দল দিল্লির প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রথম দাবিদার ছিল, শুধু কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছিল ১৯৯১ সালের নরসিংহ রাও সরকারে। ৮৪-এর মধ্যে ৫টি আসন পেয়ে সেবার সরকার গড়েছিল তারা। বৃহত্তর এই প্রদেশে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক স্লোগানেরও পরিবর্তন হয়েছে। ৯০ দশকে জনপ্রিয় স্লোগান ছিল— ‘রুটি, কাপড়া ঘর’, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ছিল ‘বিজলি, সড়ক, পানি’, ২০১৪-তে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয় স্লোগান ছিল, ‘পড়াই, কামাই, দাওয়াই’। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যেভাবে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল ২০১৭-র বিধানসভা নির্বাচনে তারা অনুরূপ প্রদর্শন করবে। ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২২-এর ধারাবাহিক ঈর্ষণীয় সাফল্যে ২০২৪-এ বিজেপির ভিত স্থাপিত হলো, সেই সঙ্গে অবশ্যই আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপির পছন্দের প্রার্থীর দাবি পোক্ত হলো। উত্তরপ্রদেশ জয়ে বিজেপি যৌথ সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাসরুট স্তরে কাজ করেছে। ভোট ভাগাভাগিতে সমতা রাখতে আপনা দলের, নিষাদপার্টিকে ভরসায় রাখা খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। জাতপাতের সমীকরণ বদলে সেটাকে গ্রেটার হিন্দুত্বভোটে পরিবর্তন করা ছিল বিজেপির সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ইস্যু এবং তাতে দল যথেষ্ট সফল হলফ করেই বলা যায়। সপা ছাড়া বাকি কোনো বিরোধী দলই সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, তাই দলিত নেত্রী মায়াবতী এক সাংবাদিক সম্মেলনে অকপটে স্বীকার করেন শুধু কংগ্রেসমুক্ত নয়, বিরোধীমুক্ত করাই বিজেপির প্রধান লক্ষ্য। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন কৃষিবিলের বিরূপ প্রভাব অন্ততপক্ষে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বিজেপির গলার কাঁটা হবে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এবং বিতর্কিত ৩টি কৃষিবিল ফিরিয়ে নেওয়া তুরুপের তাস প্রমাণিত হয়েছে। যোগী সরকার ২-তে রাজ্যের মহিলা ভোটারদের যোগদান ছিল খুব বেশি; কেন্দ্র ও রাজ্যের উজ্জ্বলা যোজনা, গ্রামীণ শৌচালয় ব্যবস্থা, প্রধানমন্ত্রী সম্মান নিধি প্রভৃতি যোজনা তাঁদের খুব আকৃষ্ট করেছে।

নরেন্দ্র মোদীর কোনো বিকল্প মুখ এখনো ভারতীয় জনতা পার্টিতে কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এতদিন যাবৎ মোদীর একান্ত বিশ্বস্ত অমিত শাহকে বিজেপির দ্বিতীয় মুখ ধরেই পার্টি এগিয়ে চলছিল। কিন্তু যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশে পুনরায় আবির্ভাব তাঁকে বিজেপির সবচেয়ে ফায়ারব্র্যান্ড নেতায় পরিণত করেছে। লালকৃষ্ণ আদবানী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর একান্ত সহযোগী এবং দলের সাংগঠনিক প্রধান ছিলেন তিনি আয়োজন করেছিলেন মেগা রথযাত্রার কিন্তু প্রধানমন্ত্রিত্বের স্বাদ সেই অধরাই রয়ে গিয়েছিল (যদিও পার্টি তাঁকে একবার প্রধানমন্ত্রী প্রজেক্ট করেছিল)। অমিত শাহ নিঃসন্দেহে দলের প্রধান সেনাপতি থেকে সভাপতি করে একের পর এক বিজয় বিজেপির ঝুলিতে ভরিয়ে দিয়েছেন। গুজরাট সফরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের পর দিল্লিতে আবার সহযোগী হন প্রধানমন্ত্রী মোদীর। তাঁর নেতৃত্বেই রদ হয়েছে কাশ্মীরে ধারা ৩৭০, ৩৫-এ, তিন তালাক। ২০১২ সালে গুজরাটে নরেন্দ্র মোদী হ্যাট্রিক ইস্যুর দলের কেন্দ্রীয় নেতা অরুণ জেটলি, রাজনাথ সিংহ, সুষমা স্বরাজদের পেছনে ফেলে ২০১৪ সালের প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রধান দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন। আঞ্চলিক রাজনীতি থেকে দিল্লির রাইসিনা পর্যন্ত সফরে সম্ভবত মোদীই প্রথম ব্যক্তি। ১০ বছর পর ২০২২ সালে যোগীকে সেই ভূমিকায় দেখে এভাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। স্বভাবতই দেশের সবচেয়ে বড়ো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বর্তমান গুরুত্ব বিজেপি শাসিত অন্য মুখ্যমন্ত্রীদের থেকে অনেক বেশি। যোগীজীর বাড়তি পাওনা তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, উত্তরপ্রদেশে রাজনৈতিক হাতেখড়ি এবং প্রখর হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তিত্ব। মুখ্যমন্ত্রী যোগী গত ৫ বছরে মাফিয়া মুক্তার আনসারী, আতিক আহমেদ, আজম খানদের উপর ছিলেন খড়্গহস্ত। জোর গলায় বক্তৃতা করেছেন আব্বাজান-কবরস্থান, ৮০ : ২০, লাভ জেহাদ প্রভৃতি বিতর্কিত ইস্যুতে সমালোচকরা তাঁকে ‘বুলডোজার বাবা’ হিসেবে নামকরণ করেছে। তবে যোগী আদিত্যনাথকে প্রধানমন্ত্রীর মসনদ স্পর্শ করতে হলে নরেন্দ্র মোদীর মতো নিজেকে আরও সংশোধন করতে হবে— পরিবর্তন, হিন্দুত্ব এবং সবকা সাথ সবকা বিশ্বাসে জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সবাইকে আশ্বস্ত করে চলতে হবে। □

With Best Compliments
from -

A
Well Wisher

নবাবের বংশপরিচয় থেকে হিন্দু বংশলতিকায়

কৌশিক রায়

ভাগীরথী নদী থেকে এক কিলোমিটার উজানে, মুর্শিদাবাদের খোশবাগে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমাধির পাশেই আছে তাঁর প্রিয়মহিষী এবং ক্লাইভের হাতে পলাশীর প্রান্তরে বাঙ্গলার নবাবিয়ানার পতনের করুণ সাক্ষী লুতফুন্নেসার কবর। তবে, লুতফার কবর থেকে অনতিদূরে আছে সিরাজের এক অনাদৃত বেগমের সমাধি। তিনি হলেন হিরা বিবি বা আলেয়া বেগম। এই হিরাবিবির মাধ্যমেই বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বংশের সঙ্গে হিন্দুদের একটি সম্পর্ক গোপনে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কেননা হিরাবিবি বা আলেয়া বেগম ছিলেন সিরাজের অন্যতম হিন্দু সেনাপতি মোহনলালের নিজের বোন।

পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ আর বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন দুই অকুতোভয় সেনাধ্যক্ষ— মীরমদন ও মোহনলাল। নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর প্রান্তরে' কবিতায় লিখেছিলেন, বেনিয়া ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী দূরভিসন্ধি সম্পর্কে ভারতবাসীকে কীভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন মোহনলাল—

'সামান্য বণিক এই শত্রুগণ নয়।
দেখিবে তাদের হায়!
রাজ-রাজ্য-ব্যবসায়,
বিপণি, সমর ক্ষেত্র, অস্ত্র বিনিময়।'

মোহনলাল খুব সম্ভবত কাশ্মীরি ডোগ্‌রী ব্রাহ্মণ বংশজাত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঠানবীর ও মোগলবিজয়ী শেরশাহ সুরির এবং মহীশূরের টিপু সুলতানের সেনাপতি এবং বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন দু'জন ডোগ্‌রী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজিৎ গৌড় ও পূর্ণাইয়া পণ্ডিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক অমিত দে জানিয়েছেন— পলাশীর যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন মোহনলাল। তারপর কিন্তু তাঁর আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। একজন দক্ষ অশ্বারোহী হিসেবে মোহনলাল সুপরিচিত ছিলেন। অধ্যাপক অমিত দে তাঁর গ্রন্থে 'সিরাজের পুত্র ও বংশধরদের সন্ধানে' মোহনলাল এবং রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হওয়া আলেয়া বেগমের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকেও একসময় আলেয়া বেগমের ওপর গবেষণা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। অধ্যাপক দে জানিয়েছেন, আলেয়াই সিরাজের একমাত্র পুত্রের জন্ম দেন। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর মিরজাফরের পুত্র মিরনের নির্দেশে মোহনলাল নিহত সিরাজের সেই একমাত্র পুত্রটিকে নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের মৈমনসিংহে পালিয়ে যান। সেখানকার একজন জমিদারকে অনুরোধ করে তিনি ওই পুত্রটিকে দত্তক নেওয়ান। এরপরে মোহনলাল ছদ্মবেশে একাকী পালিয়ে যান উত্তরবঙ্গে, সম্ভবত জলপাইগুড়ি বা কোচবিহার জেলাতে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন কর্ণধার অমলেন্দু দে একবার জানিয়েছিলেন, মৈমনসিংহের ওই জমিদার, দত্তক নেওয়া সিরাজের ওই পুত্রসন্তানটির নাম রাখেন যুগলকিশোর রায়চৌধুরী।

দিল্লির গ্লোবাল কঁসিয়ার্জ ইন্ডিয়ার মুখ্য কার্যনিবাহী আধিকারিক লালা অজয় কুমার দে জানিয়েছেন, মিরজাফরের সাহায্যে ইংরেজরা মোহনলালকে হাতেনাতে পাকড়াও করার জন্য ফাঁদ পেতেছিল। তারা আলেয়া বেগমকে এরজন্য টোপ বানিয়ে একটি বাড়িতে নিরাপদে রেখে দেয়। ইংরেজরা আশা করেছিল মোহনলাল নিশ্চয়ই অন্তত একবার তাঁর আদরের বোনের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। মোহনলাল কিন্তু আলেয়ার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। তখন সম্ভবত ক্রুদ্ধ ইংরেজরা আলেয়া বেগমের ওপর নির্মম অত্যাচার করা শুরু করে। তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

জানা গেছে, সিরাজের পুত্রকে মৈমনসিংহের যে জমিদার দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নাম ছিল কৃষ্ণগোপাল রায়চৌধুরী। হিন্দুশাস্ত্র ও আচারবিধি পালন করেই ছেলেটিকে দত্তক নেন হিন্দু জমিদাররা। তবে মোগল বাদশাহ আকবরের রাজপুত স্ত্রী যোধাবাঈকে যেভাবে ভারতের ইতিহাসে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে, হতভাগিনী আলেয়া বেগম কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার কণামাত্রও পাননি। ভারতের ইতিহাসবিদরা এই ট্র্যাজিক নারীর হিন্দু নামটি জানারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করেননি সাঙ্ঘা তেনজিন

সন্দীপ চক্রবর্তী

মানুষের বয়েস যখন অনেকটাই বেড়ে যায় তখন তার মনে মৃত্যু বাসা বাঁধতে শুরু করে। হয়তো সবসময় সচেতন ভাবে নয়, নিজের অজান্তেই যে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে। মানুষের জীবনের এই পর্বটি সাঙ্ঘাতিক। জীবনের দাম তখন কানাকড়িও নয়।

তবে সবাই যে জীবনের শেষবেলায় এরকম হালছাড়া নাবিকের মতো নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন তা অবশ্যই নয়। কেউ কেউ মৃত্যুকে খুব স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে ধরে নিয়ে জীবনকে আরও উজ্জ্বল করে যান। এমনই একজন মানুষের নাম সাঙ্ঘা তেনজিন। তিনি আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মানুষ। তাঁর পরিচয়, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, তিব্বতী ভাষায় যাদের বলা হয় লামা। কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব অন্য জায়গায়। জীবদ্দশাতেই তিনি চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর দেহটি মমি করে রাখা হোক। এবং তার জন্য সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শুরু করেছিলেন একটি জীবন্ত শরীরকে মমিতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস।

এখান থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট। আজ থেকে ৫২২ বছর আগে ভারত মৃতদেহকে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মমিতে রূপান্তরিত করার বিদ্যে জানত। প্রাকৃতিক উপায়ে দেহ সংরক্ষণের জ্ঞান ভারতের বাইরে একমাত্র জাপানে ছিল। বস্তুত, ঊনবিংশ শতকেও জাপানের কয়েকজন বৌদ্ধ ধর্মগুরুর দেহ এই উপায়ে সংরক্ষিত হয়েছে। পরে জাপান সরকার আইন করে এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দেয়। এই নিষেধাজ্ঞা কী কারণে সেটি দেহ সংরক্ষণের এই বিশেষ পদ্ধতিটি আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। সেই সঙ্গে এও বোঝা যাবে যে কেন এই পদ্ধতি বা প্রথা ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মধ্যে আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

সাঙ্ঘা তেনজিনই ভারতে একমাত্র ব্যক্তি মৃত্যুর আগে যার দেহ প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সাঙ্ঘা তেনজিন আস্তে আস্তে খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ভাত, সব জাতীয় খাবার ও আলু তো একেবারেই খেতেন না। এসব খাবার ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেট প্রধান, যা খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে মমি করতে হলে শরীরকে যথাসম্ভব শুকনো করা প্রয়োজন। ত্বক শুষ্ক করার জন্য তেনজিনের গায়ে গরম মোম মাখানো হতো। তেনজিন ধ্যানাসনে বসে থাকতেন, শিষ্যরা গুরুর শরীরটি শুষ্ক থেকে শুষ্কতর করার কাজ করতেন। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, তেনজিনের মৃত্যু হয়েছিল ধ্যানস্থ অবস্থায়। মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুদিন ধরে বলেছিল গরম মোম মাখানোর প্রক্রিয়া। ধীরে ধীরে মমিতে পরিণত হয় জেনজিনের মৃতদেহ। পরে মাটির নীচে একটি ঘর তৈরি করে সেখানে রাখা হয় মমিটি।

হিমাচল প্রদেশের গিউ নামের গ্রামে এখনও রয়েছে সাঙ্ঘা তেনজিনের মমি। যদিও তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল গিউ থেকে কিছুটা দূরে। জায়গাটা ভারত-চীন সীমান্তের কাছে। ইন্দো-টিবেটান পুলিশের এক্তিয়ারভুক্ত অঞ্চলে। স্থানীয়রা সাঙ্ঘা তেনজিনের কথা জানলেও তাঁর মমির সন্ধান পাওয়া যায় অনেক পরে। ১৯৭৫ সালে উত্তর ভারতে ভূমিকম্পের সময় হঠাৎই আবিষ্কৃত হয় ভূগর্ভস্থ ঘরটি। তারপর ২০০৪ সালে ইন্দো-টিবেটান পুলিশের একটি বিশেষ দল ঘর থেকে বের করে মমি। মৃত্যুর পর ৫২২ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও সাঙ্ঘা তেনজিনের দাঁত ও নখ অক্ষত। তিনি বসে আছেন। দেখলে মনে হবে তাকিয়ে রয়েছেন দর্শকদের দিকে। স্থানীয়রা বলেন, অনেক বছর আগে এই অঞ্চলে একবার বিছের মারাত্মক উপদ্রব হয়েছিল। বিষাক্ত বিছের কামড়ে অনেক মানুষের মৃত্যু হচ্ছিল। বিছের উপদ্রব বন্ধ করার জন্যেই সাঙ্ঘা তেনজিন নিজের মৃত্যুকে এগিয়ে নিয়ে আসার এবং মৃতদেহটি সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেন। সাঙ্ঘা যেদিন মারা যান সেদিনই এখানকার আকাশে এক রামধনু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এবং তার আলোতেই মিলিয়ে গিয়েছিল হাজার- হাজার বিষাক্ত বিছে। হয়তো অনেকে বলবেন এসব গালগল্প। ইতিহাস নয়। কথাটা মেনে নিয়েও বলা যায়, পাঁচশো বছর ধরে যে গল্পটিকে রয়েছে তাকে গায়ের জোরে উড়িয়ে দেওয়াও বিজ্ঞানসম্মত নয়। সুতরাং সাঙ্ঘা তেনজিনকে নিয়ে আরও গবেষণা হোক এটাই কাম্য। একমাত্র তাতেই জানা যাবে কোনটা গল্প আর কোনটা ইতিহাস। □

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

গত ১০ এপ্রিল হাওড়া জেলার শিবপুর থানার কাছেই, যাকে একেবারে বলা চলে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পবিত্র রামনবমীর শোভাযাত্রার উপর একদল দুষ্কৃতীর ইট বর্ষণে ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণে পুলিশ-সহ শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এটা একটা শুধুমাত্র ঘটনা নয়। এর সঙ্গে অনেক মৌলিক প্রশ্ন জড়িত। (১) মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, 'রামনবমীর মিছিলে বাধা দেওয়া যাবে না', তাহলে শোভাযাত্রায় ইট বর্ষণ হলো কেন? (২) কারা করল এই জঘন্য অপরাধ? (৩) তাদের উপর কি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর আইন চলে না? (৪) কারা তারা? (৫) পুলিশ ৪৮ ঘণ্টা পরও তাদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করল না? (৬) যত ইট রাস্তায় ঘটনার পর পড়েছিল তা আগে থেকেই মজুত করা হয়েছিল। পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা কী করছিল? এভাবে হালকা করে দেখা হলো কেন? এভাবেই কি রাজ্যে শাসন চলবে? এটাই কি সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতার নিদর্শন? (৭) ভোটের কথাই অগ্রাধিকার কেন? (৮) ঘটনার পর কারাই-বা তাড়াতাড়ি রাস্তার উপর পড়ে থাকা ইট সরিয়ে ফেলেন? এভাবে চোখ বন্ধ রাখলে ঝড় থামবে না।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারী রোড, হাওড়া-৯

মগরাহাটের জোড়া খুন সাম্প্রদায়িক জঙ্গিপনার ইঙ্গিত

মগরাহাট মোহনপুর অঞ্চলে নৃশংস জোড়া খুনের হত্যাকাণ্ডের কুখ্যাত জঙ্গি জানে আলম মোল্লা। রমজান মাসে তার গোডাউনের শাটার বন্ধ করে গোরুর মতো ওই দুজনকে জবাই করে, ঠিক 'দ্য কাশ্মীর ফাইলে' যেভাবে দেখানো হয়েছে। নিহত দুজনের পরিচয় হলো একজন মগরাহাট থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার বরুণ চক্রবর্তী, আর একজন মলয় মাখাল। দুজনই শাসক দলের ঘনিষ্ঠ। জানে আলমের সিন্ডিকেটের ব্যবসা। ঘর তৈরির জন্যে বিল্ডিং মেটিরিলিয়াস সাপ্লাই দেবে বলে অগ্রিম টাকা নেয় মলয়ের কাছ থেকে। দীর্ঘদিন ধরে মাল দেয় না, টাকাও ফেরত দেয় না। ফোনে টাকা দেব বলে তার গোডাউনে ডেকে নিয়ে এভাবে তাদের নৃশংসভাবে খুন করে।

এখন একটু পিছনে গিয়ে জেনে নেওয়া যাক কে এই জানে আলম? সে এক সময় চাকুরি দেবার নাম করে মানি চেইনের ব্যবসা শুরু করেছিল। তার ফাঁদে পড়ে অনেক বেকার যুবক-যুবতী প্রতারিত হয়েছিল। তার ওই প্রতারণার ব্যবসা এক সময় ধরা পড়ে। পুলিশ তাড়া করার সময় তার পকেট থেকে পিস্তল-সহ গুলি উদ্ধার করে। কিন্তু আইনের ফাঁকে হাইকোর্টে প্রমাণিত হয় ওই পিস্তলটা তার নয়, সেটা নাকি পুলিশের ছিল। মগরাহাট থানার তৎকালীন ওসি তমাল দাসকে হাইকোর্টের বারান্দায় কাঁদতে দেখেছিলাম। সেদিন এই পত্রলেখককে তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন আইন বড়ো দুর্বোধ্য, কমলবাবু। ওই মানি চেইনের ব্যবসা বাড়বাড়ন্ত করার জন্যে সে সিনেমার প্রোডিউসার সেজে ছিল। প্রসেনজিৎ-সহ টলিউডের কিছু নায়ক, নায়িকাকে নিয়ে কিছুদিন সুটিং করেছিলেন। সিনেমার নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

আনন্দ বাজারের মতো পত্রিকায় হেডিংও হয়েছিল জানে আলমের নামে। একাধিক খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, মস্তানির অভিযোগে সে অভিযুক্ত। তার ভাই আলমগির মোল্লা আমড়াতলার অঞ্চলপ্রধান ছিল এবং বর্তমান মগরাহাট তৃণমূলের ব্লক সহ-সভাপতি। শাসক শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ হলে অবাধে মস্তানি করা যায়, তা সকলের জানা। শাসকের শাসনও নেই বলে এখানে কেবল জঙ্গিদের রাজত্ব আছে। এটা উত্তরপ্রদেশ হলে এতোক্ষণে তাকে বুলেট দিয়ে অভিবাদন জানানো হতো কিংবা আইনের অনুশাসন থাকলে এতোদিন সে জেলের ঘানি টানতো। এখানে দুটোর কোনোটাই নেই। তাই এরকম কুখ্যাত জঙ্গি শাসকশ্রেণীর ছত্রছায়ায় বঙ্গের প্রত্যেকটা অঞ্চলে অবাধে বিচরণ করছে। তৃণমূলের অন্দরে লেখা হলেও হিন্দুদের রক্তে হোলি খেলা হচ্ছে, এটা এখন প্রত্যেকের ভাবা দরকার।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের তাণ্ডব

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাছে নিগৃহীত হলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। আমরা অবাক ও হতভম্ব হয়ে সেই খবর দেখেছি বা পড়েছি। শিক্ষকদের উপর অত্যাচার এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। গিয়াসউদ্দিনরা বরাবরি এই সমাজে আছে ও থাকবে। আমার কথা হচ্ছে, তোদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে না কেন? সে যে পার্টিরই হোক না কেন, আমি মনে করি তারা কখনই ছাত্র হতে পারে না।

শিক্ষককে কদর্য ভাষায় গালিগালাজ, তুই তুকারি করা এবং চড় মারার হুমকি— এটা কি কোনো ছাত্রের ভাষা হতে পারে? সমাজবিরোধীর তকমা লাগিয়ে শিক্ষাকে আরও কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। একজন সমাজবিরোধী সে কী করে কলেজের মধ্যে ঢুকতে পারে? সে কী করে কোনো পার্টির পদে থাকতে পারে? প্রাক্তন ছাত্রনেতা গিয়াসউদ্দিন দলবল নিয়ে কি করে একজন সম্মাননীয় পদকে কলুষিত করতে পারে। গ্রেপ্তার করে চারদিনের মধ্যে জামিন পেয়ে তার কী হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার বলে আমরা সাধারণ মানুষ মনে করি। ভবিষ্যতে এরপর যেন আর কখনোই এই রকম অসভ্যতা

ফঃ ৩

আমাদের দেখতে না হয়। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে ভাবলে অবাক হতে হয়।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাকরোড, হুগলী।

পশ্চিমবঙ্গকে মুসলিমবঙ্গে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে

যে পশ্চিমবঙ্গকে প্রয়াত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তাঁর একক প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের কবল থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন সেই পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমবঙ্গে পরিণত হওয়া কি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা? সম্প্রতি অর্গানাইজার পত্রিকার এক সাংবাদিক বাংলাদেশ পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বাংলাদেশ সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দুই দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলেও পরিভ্রমণ করে ওই সমস্ত অঞ্চলের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে প্রতীয়মান হয় ওইসব অঞ্চলে ইসলাম শাসন কায়েম হওয়া সময়ের অপেক্ষামাত্র। উল্লেখিত, শহর সংলগ্ন গ্রাম বা শহরতলিতে জনবিন্যাসের প্রচণ্ড রকমের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশ থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রম করে এসে ওইসব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করছে। ফলে জনবসতির আমূল পরিবর্তন ঘটে চলেছে। মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর ওইসব অঞ্চলের প্রকৃত হিন্দু বাসিন্দারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে চলেছে ক্রমাগত। ফলে স্থানীয় প্রকৃত হিন্দু বাসিন্দারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে অন্য কোনও হিন্দু প্রধান অঞ্চলে চলে যাচ্ছেন। চলে যাওয়ার আগে নিজেদের বাড়িঘর, জমিজমা, ব্যবসা এবং অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর, সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছেন। অনেক সময় প্রতিবেশী কিছু মুসলমান স্বেচ্ছায় প্রতিবেশী হিন্দুদের ফেলে যাওয়া বাড়ি ঘর, জমিজমা, ফলের বাগান প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিচ্ছে। কিছুদিন পর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া মুসলমানরা প্রায় একরকম জলের দরেই ওইসব বাড়িঘর, জমিজমা, বাগান, ব্যবসা প্রভৃতি কিনে নিয়ে প্রকৃত মালিক বনে যাচ্ছে হুজ্জোতি বা দাঙ্গা হাঙ্গামার ভয় দেখিয়ে। তাই ওই সব অঞ্চলের বেশিরভাগ আমবাগান, সবজিবাগান, বাজার প্রভৃতি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। সেই সাংবাদিক আশ্চর্যান্বিত হয়ে আরও বলেছেন ওইসব অঞ্চলে মাদ্রাসা, বিদ্যালয়, কলেজ, নার্সিংহোম, ফার্মেসি প্রভৃতি সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবছর মোটামুটিভাবে প্রায় জনাপঞ্চাশেক পড়ুয়া ওইসব মাদ্রাসাগুলি থেকে সৌদি আরবে পাড়ি জমায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে ইমাম বা বুখাড়ি হওয়ার বাসনায়। ওইসব মাদ্রাসাগুলি ৭ থেকে ৩০ বয়স অবধি পুরুষ বাচ্চাদের ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে থাকে। এরা সারা দেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা অর্থ ব্যবস্থা থেকেও অর্থ সংগ্রহ করে। সাংবাদিক আশ্চর্যান্বিত হয়ে জেনেছিলেন অসংখ্য মুসলমান পুলিশ অফিসার সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দনগর।

দ্য কাশ্মীর ফাইলস সিনেমায় প্রকৃত পর্দা ফাঁস

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সত্য কাহিনি কী? ফারুক আব্দুল্লাহ ৮০ জন টেররিস্টকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও পরিকল্পিত ভাবে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন। উদ্দেশ্য, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নৃশংস ভাবে খুন করা। কংগ্রেসের মিথ্যাচারিতা, সেই সঙ্গে বামপন্থীদের অনবরত মিথ্যাচার এই সমস্তটাই পর্দা ফাঁস করেছে কাশ্মীর ফাইলস সিনেমা। এটা করতে গিয়ে বিবেক অগ্নিহোত্রী, অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী, পল্লবী যোশীরা বিগত দিনের অন্ধকার জগতের পাপ ধুয়ে দিতে যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা প্রশংসাযোগ্য। আলোচনা প্রেক্ষিতে সিনেমা জগতে কমিউনিস্টদের আঘাত— অপর্ণা সেন পরিচালিত 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার' ছবিতে হিন্দু ধর্মকে ছোটো করে ও হিংস্র করে দেখানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন, হিন্দু সংস্কৃতিকে আঘাত করে।

২০১৭-তে কৌশিক গাঙ্গুলী 'বিসর্জন' ছবিতে বাংলাদেশের হিন্দু বিধবা পদ্মার সঙ্গে মুসলমানদের প্রেমের কাহিনি হিন্দু ধর্মকে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। অনুরাগ রস 'কাবুলিওয়ালা' ছবিতে মিনিকে দিয়ে নামাজ পড়ানো হয়েছে। হীরেন নাগ পরিচালিত 'সবরমতি' সিনেমায় সমাজের বিভাজন মার্কসিজমের প্রতিফলন। মৃণাল সেন পরিচালিত 'আকাশ কুসুম' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন অভিনীত অর্থনৈতিক বিভাজন মাধ্যম মার্কসিজম। যে কমিউনিজমে ১২ কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল সে কমিউনিজমের ১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতন ঘটেছে। আর সেই মার্কস-লেলিনকে আর মানুষ মেনে নেবে না। পক্ষান্তরে পৃথিবীর আর একটি ইতিহাস যদি লক্ষ্য করি দেখবো— হলোকাস্টের ইতিহাস জার্মান জাতির কাছে যতই অবমাননাকর হোক ইতিহাস অস্বীকার করা আজকের জার্মানিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু ভারতে সিংহ ভাগ বুদ্ধিজীবীর অবস্থান তার উলটো। দেশ ভাগের যন্ত্রণাক্লিষ্ট ইতিহাস তারা গোপন করেছেন বা ভুলিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। দেশ ভাগের পর নেহরুবাদী লেখক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকরা বিকৃত ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন।

ব্রিটিশপ্রেমী নেহরুবাদীরা ব্রিটিশদের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ, কমিউনিস্টদের সমর্থনে দেশ ভাগ। দ্য কাশ্মীর ফাইল কোনো অপরাধ যোগ্য নয় বা অসত্য নয়। পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সত্যকে তুলে ধরা একান্ত প্রয়োজন। ৬০ লক্ষ ইহুদি হত্যাকারী জার্মান সেনাপতি অ্যাইকম্যানের দেরিতে হলেও বিচারে তার ফাঁসি হয়েছিল। কিন্তু ভারতে হিন্দু হত্যাকারীদের কোনো বিচার হয়নি।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

গরমে ভারী ব্যায়াম বন্ধ রাখাই ভালো

ডাঃ নুপুর বিশ্বাস

গরমে খাবারে অরুচি বেশি হয়। আয়ুর্বেদ মতে তার কিছু চিকিৎসা।

গরমের সময় বেশি করে জল এবং জল যুক্ত খাদ্য খাওয়া উচিত, কারণ জল আমাদের শরীরে পাচন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। এই গরমের সময় আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে ঘাম উৎপন্ন হয়। এই ঘামের মাধ্যমে আমাদের শরীরের অনেক জল বেরিয়ে আসে ফলে শরীরে ডিহাইড্রেশন তৈরি হয়। তাই আমরা যদি পরিমাণ মতো জল বা জল যুক্ত খাবার না খাই তখন অগ্নিমন্দা হয় এবং এর থেকে অরুচি সৃষ্টি হয়।

১. চিচিঙ্গা : চিচিঙ্গা সিদ্ধ করে অল্প লবণ মিশিয়ে ও মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে খেলে উপকার হয়।

২. নিসিন্দা : নিসিন্দা পাতা ঘিয়ে ভেজে খেলে পুরনো অরুচি রোগ ভালো হয়ে যায়।

৩. পেয়ারা বা আপেল : পেয়ারা বা আপেল খেলে অরুচি দূর হয়।

৪. রসুন : রসুনের সুপ অরুচি ভালো করতে খুব কার্যকর। ৩-৪ কোয়া রসুন এক কাপ জলে সিদ্ধ করে লেবুর রস মিশিয়ে দিনে দু'বার করে পান করলে কয়েক দিনেই অরুচি সেরে যাবে।

৫. তেজপাতা : তেজপাতা সিদ্ধ করে সেই জল দিয়ে কুলি

করলে অরুচি ভালো হয়।

৬. অড়হড় : অরুচি যত পুরনোই হোক না কেন অড়হড় ডালের জুস অল্প আদা ও মরিচ বাটা দিয়ে সাঁতলে তার সঙ্গে পরিমাণ মতো লবণ মিশিয়ে বারবার একটু একটু করে খেতে হবে।

৭. গোল মরিচ : পেটে বায়ু ও খেতে অরুচি হলে শুকনো কুল ও গোলমরিচের গুঁড়ার সঙ্গে সৈন্ধব লবণ ও চিনি মিশিয়ে মাঝে মাঝে চেটে খেলে পেটের বায়ু কমবে এবং অরুচি দূর হবে।

৮. হেলেঞ্চা : মুখে অরুচি, জিবে স্তর পড়ে আছে, এ অবস্থায় হেলেঞ্চা শাকের ২ চামচ রস গরম করে কয়েকদিন খেলে উপকার হয়।

৯. নিম : যে অরুচিকে কমানো যায় না, সে অবস্থায় সুজির হালুয়ার সঙ্গে নিম পাতা গুঁড়ো ২৫০-৩০০ মিলিগ্রাম মিশিয়ে খেলে কয়েক দিনের মধ্যেই উপকার পাওয়া যায়।

১০. খেসারির ডাল : খেসারির ডাল গরম জলে ভিজিয়ে খেলে পিত্তের আধিক্যের কারণজনিত অরুচি ভালো হয়।

১১. ধনে : ধনে ভেজে মিহি গুঁড়ো করে ১-২ গ্রাম মাত্রায় অল্প লবণ ও মরিচের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে অরুচি চলে যায়।

১২. করলা : পিত্ত বিকারে অরুচি হলে করলার রস এক চামচ করে প্রতিদিন দু'বেলা খেলে উপকার পাওয়া যায়।

১৩. কমলা লেবু : প্রতিদিন ১-২টি কমলা খেলে অরুচি দূর হয়ে যায়।

সানস্ট্রোক, লু ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে এই সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত

(ক) গরমে খুব বেশি হাঁটা, অত্যধিক পরিশ্রম, অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ পরিহার করুন। পোশাক পরুন আরামদায়ক। হালকা রং বেছে নিন পোশাকের জন্য।

(খ) নিজস্ব পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।

(গ) গরমে এই শারীরিক পরিবর্তনগুলোকে প্রতিরোধ করতে খাবারের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রীষ্ম ঋতুতে মধুর রস প্রধান দ্রব্য ও শীতল দ্রব্য যেমন শরবত গ্রহণ করা যেতে পারে। ছোলার ছাতুর মধ্যে সামান্য ঘি আর ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে এবং স্নিগ্ধ অন্ন সেবন হিতকর।

(ঘ) গ্রীষ্মকালে প্রত্যেক দিন মদ্য পান করা উচিত না। আর যদি একান্ত পান করার দরকার হয় তাহলে অল্প পরিমাণ মদে বেশি পরিমাণ জল মিশিয়ে পান করতে হবে।

(ঙ) এই ঋতুতে লবণ অম্ল কটু রস প্রধান খাদ্য বর্জন করতে হবে।

(চ) গরম পদার্থ সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে।

(ছ) গ্রীষ্ম ঋতুতে দিনের বেলায় শীতল গৃহে (তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর) এ শয়ন করতে পারেন। রাত্রিতে সুগন্ধিত দ্রব্য অনুলেপন করে ছাদে ঘুমাতে পারে।

(জ) হালকা ব্যায়াম করতে পারেন কিন্তু ভারী ব্যায়াম করা যাবে না এবং স্ত্রী সহবাস বর্জন করতে হবে।

গরমে অ্যালার্জি থেকে যে হে ফিভার, রাইনাইটিস বা শ্বাস কষ্টজনিত রোগগুলো হয় তার থেকে রেহাই পেতে আয়ুর্বেদে বিশেষ চিকিৎসা রয়েছে। এবং তা কার্যকরী।

- চিকিৎসা সূত্র : শোধন, কফহর, শিরবরেচন, তীক্ষ্ণ ধূমপান চিকিৎসা।

পঞ্চকর্মা চিকিৎসা :

- স্নেহন : মহাতিক্ত ঘৃত দ্বারা স্নেহন করতে হবে।
- অভ্যঙ্গ : কর্পূরাদি তেল দ্বারা অভ্যঙ্গ করতে হবে।
- বাষ্প স্বেদ।
- বমন : মাদনফলাদি যোগ দ্বারা বমন করাতে হবে।

শমন চিকিৎসা :

- প্রধান ড্রাগ : পিপলী, ধাতুরা ইত্যাদি।
- নৈমিত্তিক রসায়ন : বর্ধমান রসায়ন, দশমুলা রসায়ন, চিত্রক হরিতকি, ব্যাঘৃ হরীতকী, অগস্ত্য হরীতকী ইত্যাদি।

ক্লাসিক্যাল ফর্মূলা :

- ক্যাপ কফকুঠার রস ১টা করে ক্যাপসুল তিনবার খেতে হবে/ শ্বাস কফকুঠার রস ১টা করে তিন বার খেতে হবে।

প্রস্তাবিত শাস্ত্রীয় সূত্র :

- চ্যবনপ্রাশ লেহ : ১ চামচ করে গোদুগ্ধের সঙ্গে খাবার পরে দু'বার করে খাওয়া উচিত।
- হরিদ্রা খণ্ড : ১ চামচ করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাবার পরে প্রত্যেক দিন তিন বার করে খেতে হবে।
- সমীরপন্নগরস : ১২৫ মিলিগ্রাম করে তিন বার খেতে হবে।

Recommended Proprietary Formulations :

- Cap. Sino (AAF)-I TID.
- Allerkhanda (Nagarjuna)-Itsf TID.
- Syrup Bresol (Himalaya)-2tsf TID.

এই চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই কার্যকরী, তাছাড়া আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক দিন চবনপ্রাশ গ্রহণ করতে পারি যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

কসমেটিক সানস্ক্রিন লোশনের পরিবর্তে প্রাকৃতিক ভেষজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১) নারকেল তেল : নারকেল তেল শরীরের খোলা অংশে লাগিয়ে যদি বাড়ি থেকে বেরোনো যায় তবে তা সানস্ক্রিনেরই কাজ করে থাকে। ত্বকের লালচে ভাব বা ত্বক পুড়ে যাওয়ার সমস্যা কম দেখা যায়।

(২) অ্যালোভেরা : ত্বকে যদি কোনও অ্যালোভেরা ক্রিম বা অ্যালোভেরা জ্যুস লাগিয়ে নেওয়া যায়, তবে তা থেকেই ত্বকে ট্যান পড়ার সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়।

(৩) চন্দন : চন্দন বেটে ত্বকে লাগিয়ে রাখলে রোদ থেকে হওয়া সমস্যা অনেকাংশে কমে যায়। তাই চন্দন ত্বকে লাগিয়ে রাখলে তা সানস্ক্রিনের অভাবে ঘটা ক্ষতির হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করবে।

(লেখক আয়ুর্বেদ চিকিৎসক)

পশ্চিমবঙ্গ আগের ঋণের সুদ মেটাতে আবার ঋণ করে

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

অর্থনৈতিক ও সামরিক বিচারে ভারতের ব্যপ্তি বা শক্তি কতটা সে বিষয়ে আমাদের অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। খবরের কাগজ বা অন্য মিডিয়ারাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস। সেই সঙ্গে যোগ হয় আমাদের আশৈশব গড়ে ওঠা বদ্ধমূল ধারণা। সুখে থাকার সূচকে যে ভারত শ্রীলঙ্কার বা বাংলাদেশের নীচে কিংবা পাকিস্তান, আফগানিস্তানের আশপাশে সেই ভারতই আবার বিশ্বে পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি। ভুটানের প্রতিরক্ষা সামলায়। জাতীয় বাজেটে অঘোষিত ভাবে বাংলাদেশ ও নেপালের জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখে। মালদ্বীপে পানীয় জল বিভ্রাট ঘটলে সবার আগে লক্ষ লক্ষ বোতল জল পাঠায়। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড়ো সাহারা।

আমি গত কদিন ধরে, National Accounts Statistics, R.B.I. bulletin, Report on Currency and Finance এবং CSO-র কিছু পরিসংখ্যান স্টাডি করছিলাম। দেখছিলাম Trade Balance, Balance of Payments, Foreign Exchange reserve, condition of food security, infrastructure development index প্রভৃতি। গুগল, ইউটিউব প্রভৃতির কৃপায় এখন cursory study অনেক সহজ হয়ে গেছে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা আইএসআই-তে reports and records section-এ যাওয়ার দরকার হয় না। যেমন ধরা যাক আমাদের রাজ্যের ঋণগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টা। রাজনৈতিক হিংসার প্রশ্নে যেমন শাসক দল অন্য রাজ্যের তুলনা আনে, এক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে কেবল আমাদের রাজ্যই নয়, ঋণগ্রস্ত রাজ্যের তালিকায় সবার ওপরে পঞ্জাব। এছাড়া মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিলনাডু, অন্ধ্রও কম-বেশি আমাদের মতো। এই তর্কে আমরা বঙ্কিমবাবুর কথাটা সচেতনভাবেই বলতে চাই, 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' তারা হাথরাস করেছে বলেই আমাকে হাঁসখালি করতে হবে? ঋণের প্রসঙ্গেও একই কথা খাটে। আমাদের সমগোত্রীয় ঋণী রাজ্যগুলো, বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, তামিলনাডু ঋণের টাকা কোন খাতে ব্যয় করছে সে তথ্য ঘাঁটলে দেখা যাবে তারা plan budget-এ, অর্থাৎ উন্নয়নে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করে। আমাদের মতো আগের ঋণের সুদ মেটাতে আবার ঋণ করে না। অর্থনীতির ভাষায় এই অবস্থাকেই debt trap বলে। আমাদের রাজ্যের কাণ্ডারি বলেছেন রাজ্য death trap-এ রয়েছে। তিনি তো বাঁশরি থেকে পাখোয়াজ সব এক সঙ্গে বাজান। হাঁটার ব্যায়াম করতে করতে বাজেট বানান। উপদেষ্টাদের সামনে রেখে চার্বাকপন্থী হয়ে হয়তো 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' মনে করাতে চান। কিন্তু স্মর্তব্য, চার্বাক ঘি খেতে বলেছিলেন, মদ্যপান করতে বলেননি।

যাই হোক, হচ্ছিল দেশ তথা শ্রীলঙ্কার কথা, চলে এলাম রাজ্যে। আসাটা একেবারেই অহেতুক নয়। আমরা যদি ওই অশ্রুবিন্দু দ্বীপরাষ্ট্রের

অর্থনীতির কলেবর বিবেচনা করি তাহলে দেখব, সাক্ষরতা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির নিরিখে তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। মাথা পিছু আয়ও ওদের আমাদের দ্বিগুণ। তবুও ভারত সে দেশকে একাই খাওয়াতে পারে। গত দু' বছর সারা দুনিয়া যখন করোনায় কয়েক কোটি ভারতীয়র মৃত্যুর আশঙ্কা করেছিল তখন এই ১৩৫ কোটির দেশ যেভাবে তা সামলেছে তার দেখে অমর্ত্য সেন, অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রণব বর্ধনরা বাড়তি বাক্যব্যয় করেননি। নানান মহলে প্রশ্ন উঠছে পশ্চিমবঙ্গ এই মহাভারতের অঙ্গরাজ্য না হলে আজ শ্রীলঙ্কার চেয়েও বড়ো বিপদে পড়ত। চাল, আলু, সবজি, চা, কয়লা বাদে একদা শিল্প উৎপাদনে দ্বিতীয় বাঙ্গলা আজ কেবলই ভোক্তা রাজ্য। মাথা পিছু আয়ে ২২তম। গম, চিনি, পেঁয়াজ, মাছ, ডিম, ডাল, ভোজ্য তেল, ওষুধ সবেতেই আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী। আমরা মেডিক্যাল কলেজ, শান্তিনিকেতন, নরেন্দ্রপুর, প্রেসিডেন্সি, শিবপুরের মতো ড্রিম ডেস্টিনেশনগুলো ছেড়ে কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট, ভেলোর, বেঙ্গালুরু ছুটবো। চাকরি করতে চেন্নাই, মুম্বাই, আহমেদাবাদ, হায়দরাবাদ, কেরল যাব। ধান কাটতে পঞ্জাব, আপেল কুড়োতে কাশ্মীর, এমনকী অরুণাচলের পরশুরাম কুণ্ডে কুম্ভ স্নানের পর ফেলে দেওয়া বসন কুড়োতে অরুণাচলের পরশুরাম কুণ্ডে যাব। তারপর বুক ঠুকে আত্মশ্লাঘা বোধ করে বলব বাঙ্গলা আজ যা ভাবে ইত্যাদি। নীরদবাবুর দেওয়া আত্মঘাতী বিশেষণটা যে এত দ্রুত সত্য প্রমাণিত হবে কেউ কখনো ভেবেছিল?

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

ঋণের বোঝায় সরকারি কর্মীদের বেতন ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে, রাজ্যে সরকারের দেওয়া মাত্র ৫০০ টাকা নেওয়ার জন্য হিড়িক, সেই রাজ্যের শাসকদলের ছোট- মাঝারি নেতাদের লাইফ স্টাইল দেখলে ভিরমি খেতে হয়। হাতে আইফোন, আঙুলে সোনার আংটি, গলায় মোটা চেন, আর সুবিশাল, সুসজ্জিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা।

জনমোহিনী প্রকল্প গড়ে দেনার দায়ে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ

ভবানী শংকর বাগচী

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের গদিতে বসেই যে ঢালাও খয়রাতির নিয়ম চালু করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি, তা আজও অব্যাহত। বাঙ্গলার জনগণকে দান-খয়রাত দিয়েই তৃতীয় দফায় বিধানসভা কবজা করে নিয়েছেন তিনি। কখনো কন্যাশ্রী, তো কখনো সবুজ সাথী। তারপর বাঙ্গলার মা- বোনেদের ৫০০ টাকা মাসোহারা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একুশের নির্বাচনে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ। ফি মাসে যদি এমন ভাতা বিনা পরিশ্রমেই পাওয়া যায় তাহলে বাবু বাঙালির আর চাই কী? রবিঠাকুর এই বঙ্গ সন্তানদের উদ্দেশ্য করেই তো লিখেছিলেন, "জন দশেকে জটলা করি তক্তপোশে বসে"। সেই ধারাকে পুনরায় অনুদানের খাতে আটকাতে পেরেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর থেকে অমিত মিত্র'র নামই হয়ে গিয়েছিল 'ধারালো অর্থমন্ত্রী'। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বরাবর তিনি ধারের ঝুলি হাতে নিয়ে তদবির করতে ছুটতেন। একে তো রাজ্যের আয় বলতে কিছু নেই। তার উপর শুধুমাত্র ভোটব্যাংক ধরে রাখার জন্য যদি একের পর এক জনমোহিনী প্রকল্প চালু করা হয়, তাতে কোষাগারে ভাঁড়ে মা ভবানী হতে বাধ্য।

সম্প্রতি পাঁচটি সর্বাধিক ঋণগ্রস্ত রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে সতর্ক করেছে দিল্লির কয়েকজন সচিব। পাঁচ রাজ্যের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের নাম থাকায় উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদরা। বিদায়কালে বামেরা ২০১১ সালে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা চাপিয়ে গেছিল। বর্তমানে এরাজ্যের ঋণ ৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। দেনার পরিমাণ ধীরে ধীরে শ্রীলঙ্কাকে ছুঁয়ে ফেলার দিকে এগোচ্ছে। গত ১০ বছরে ঋণের হার বেড়েছে ১৫৫ শতাংশের বেশি। ১০.৪ কোটি জনসংখ্যার পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার নীচে। রাজ্যে শিল্পের যা দুরবস্থা তাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হার নিম্নতম। এই অবস্থায় মমতার আমলে মাথাপিছু দেনা প্রায় ৮৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ প্রতিটি শিশু জন্মাচ্ছে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি (সিএমআইআই)-এর সমীক্ষা অনুসারে এ রাজ্যে ১০০০ জনের মধ্যে ১০৩ জন বেকার। সরকারি চাকরির নিয়োগ তথৈবচ। উন্নয়ন এখানে ত্রিফলা বাতিস্তম্ভের মতোই কসমেটিক। তা সত্ত্বেও ফি বছরে এত ধারদেনা কেন?

দেশের অর্থনীতিবিদরা এর জন্য দায়ী করেছেন মমতা সরকারের একচেটিয়া অনুদানমূলক প্রকল্পগুলিকেই। গদিতে বসেই কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খেলাশ্রী, রূপশ্রীর মতো

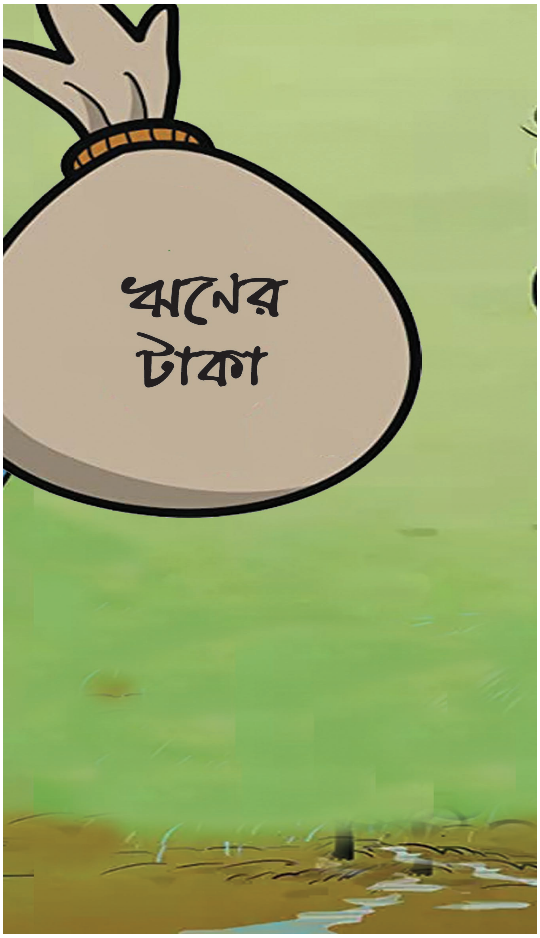

কয়েক গণ্ডা প্রকল্পের ফিতে কেটেছেন মমতা। স্থানীয় অগুনতি ক্লাবকে দু'লক্ষ করে টাকা দিয়েছেন তিনি। গত বছরেই ক্লাবগুলোর পিছনে নির্বাচনের মুখে ৮৩ কোটি টাকা ঢেলেছে রাজ্য সরকার। কন্যাশ্রী প্রকল্পে সুবিধাভোগীরা একসময় ৭৫০ টাকা করে পেত। এখন সেই খাতে বরাদ্দ বেড়ে হয়েছে ১০০০ টাকা। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুসারে প্রায় ৭২ লক্ষ সুবিধাভোগী এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। ২০২১- এর নির্বাচনের দোরগোড়ায় যখন তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সার্ভে টিম জেলায় জেলায় ঘুরে জানালো, গদিছাড়া হতে চলেছেন মমতা, তখনই 'দুয়ারে সরকার' ও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের পরিকল্পনা করে তৃণমূল সরকার। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর চালু হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। গৃহিণীরা পাচ্ছেন মাসে ৫০০ টাকা করে। এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন ১ কোটি ৬০ লক্ষ পরিবার। প্রকল্পের খাতে খরচ হচ্ছে ১২৯০০ কোটি টাকা। মহিলা ক্ষমতায়নের গালভরা বুলি আউড়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ পরিবারের ভোটব্যাংক কিনতে সরকারি গাঁটের কড়ি খরচ হলো ১২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা।

রাজ্যের অর্থনীতি নড়বড়ে। রাজস্ব আদায় পর্যাপ্ত নয়। সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ার ভাঁড়ার বাড়ন্ত। এই সেদিন ডিএ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেছেন রাজকোষের ঘাটতি নিয়ে তাঁর সরকার চিন্তিত। ডিএ তো দূরের কথা আগামীদিনে সরকারি কর্মীদের বেতন কীভাবে দেবেন সেটা তাদের ভাবাচ্ছে। ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় যথেষ্ট ভাইরাল হয়েছে। এই প্রতিবেদক অবশ্য তার সত্যতা যাচাই করেনি। কলকাতা পুরসভার অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন নিয়ে এখনো টানাপোড়েন চলছে প্রশাসনের অন্দরে। ইদানীং নাকি প্রশাসনিক খরচে রাশ টানতে নিত্যনৈমিত্তিক খরচে কিছু কাট- ছাঁট করছে রাজ্য সরকার। সেই সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও আগামী অর্থবর্ষে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের খাতে ৫৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের যা কনসেপ্ট তা কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্পের কার্বনকপি। কেন্দ্রীয় প্রকল্পটিকে সমর্থন করে তার অনুমোদন দিলে অনেক খরচ কমানো যেত। একই প্রকল্প কেন্দ্র ও রাজ্য আলাদা আলাদাভাবে রূপায়ণের দরুন রাজ্যকে অতিরিক্ত ব্যয়ভার টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তার জন্য কেন্দ্রের কাছে সদাই মমতার হাত পাতা।

একইভাবে, কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশনের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রণয়ন করেছে গীতাঞ্জলি ও মিশন নির্মল বাংলা। মোদ্দা কথা হলো ভোটের আখের গোছাতে উন্নয়নের নামে ঢালাও খয়রাতি ছড়াবে তৃণমূল সরকার। তার জন্য ধার করবে তৃণমূল সরকার। এবং ধারের বোঝা চাপবে এ রাজ্যের সাধারণ মানুষের মাথায়। অনেকে অভিযোগ করছেন, কেন্দ্রের থেকে ঋণ আদায়ের জন্য তৃণমূল সরকার কারচুপিরও আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা অভিনব উপায়ে জিডিপিতে জল মেশায়। সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সুমনা বর্ধনের একটি লেখা সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব ঘোরাঘুরি করছে। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, "তাঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) আমলে তৈরি সমস্ত প্রকল্পে অর্থের জোগান অব্যাহত রাখতে আরো বেশি বেশি করে ঋণ করতে হবে। তাই রাজ্যের আইন পরিবর্তন করা হচ্ছে। তাই জিডিপিকে অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। " অর্থাৎ তৃণমূল সরকারের তথাকথিত জিডিপিতে যে বাড়বাড়ন্তের ঊর্ধ্বমুখী রেখচিত্র দেখানো হয়, তার গণনায় নাকি জল মেশানো। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদরাই বিস্তারিত বলতে পারবেন। আপাতত এ রাজ্যের তাঁবেদার অর্থ বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে মুখ বন্ধ রেখেছেন। কেন্দ্রের হিসেবে জিডিপি যত বেশি হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য তত বেশি ঋণ পাওয়ার যোগ্য। কাজেই কারচুপিতে সিদ্ধহস্ত দলটির নজর থেকে জিডিপিও বাদ যাবে না এ কথা সহজেই অনুমেয়।

যে রাজ্য ঋণের বোঝায় গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে, সরকারি কর্মীদের বেতন ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে, যে রাজ্যে সরকারের দেওয়া মাত্র ৫০০ টাকা নেওয়ার জন্য হিড়িক লেগে যায়, সে রাজ্যে শাসকদলের ছোট- মাঝারি নেতাদের লাইফ স্টাইল দেখলে ভিরমি খেতে হয়। হাতে আইফোন, আঙুলে সোনার আংটি, গলায় মোটা চেন, আর সুবিশাল, সুসজ্জিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সম্প্রতি বীরভূমের বগটুই গ্রামের নৃশংস ঘটনার পর নিহত ভাদু শেখের বহুতল বাড়ি সবার নজর কেড়েছে। দিনমজুর ভাদু মুরগির মাংসের দোকানে হেল্পারের কাজ করতো। এ ব্যাপারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের পঞ্চায়েত প্রধান মোদাচ্ছের হোসেনও পিছিয়ে নেই। একদা কাটা তেলের ব্যবসায়ী মোদাচ্ছের এলাকায় পাঁচ- পাঁচটা বহুতল হাঁকিয়ে বসেছে। বাগনান- ১-এর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নয়ন হালদারের সুদৃশ্য অট্টালিকাও এখন দৈনিক খবরের কাগজে প্রতিবেদনের বিষয়। আরামবাগের আরাণ্ডি-১ পঞ্চায়েত প্রধান সোহরাব হোসেন একসময় একচিলতে টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরে দর্জির কাজ করতেন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরই তার সম্পত্তি ফুলেফেঁপে উঠেছে। তার কুঁড়েঘরের জায়গায় এখন তাক লাগানো অট্টালিকা। নিন্দুকেরা বলবেন এ তো ডুবোপাহাড়ের চূড়ামাত্র। কেউ বলবেন রাজ্যের ধার করা টাকায় 'ভাইদের' ব্যক্তিগত উন্নয়নই বেশি হয়েছে। আর তিনি, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তো সেই ২০১২-তেই বলে দিয়েছেন, "যা গেছে, তা গেছে"। অতএব দেনার দায় কত তা না দেখে নতুন করে যে ধার করার কথাই ভাববে তৃণমূল সরকার তা বলাই বাহুল্য। যাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পগুলোকা লুটের ভাণ্ডারে বদলে ফেলা যায়। ■

ভারতের অঙ্গরাজ্য বলে বেঁচে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ

পায়েল চ্যাটার্জী

অর্থনৈতিক সংকটের কারণে শ্রীলঙ্কার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত। প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গও কি শ্রীলঙ্কার পথে এগোচ্ছে? এই বিষয়ে আলোচনার আগে কয়েকটি বিষয় দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীলঙ্কার মোট জনসংখ্যা ২.১৬ কোটি। বর্তমানে সেদেশের ঋণের পরিমাণ ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সূত্র : ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড)। বলা হয়, কোনো দেশের জিডিপি থেকে যদি ঋণের অনুপাত বেড়ে যায়, তাহলে সে দেশের আর্থিক অবস্থানের অবনতি হতে থাকে। এক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কার জিডিপি ও ঋণের অনুপাত ১১৯ শতাংশ।

শ্রীলঙ্কার সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের চেয়ে বিনামূল্যে মানুষকে পাইয়ে দেওয়া এবং দেশের কর অর্ধেক মুক্ত করে দেওয়ায় সরকারি অর্থভাণ্ডার কমতে থাকে। ফলে বর্তমানে এই ভয়ংকর আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এই অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কীরকম? ভারতের বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী জিডিপি ও ঋণের অনুপাত ৬০ বিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের জিডিপি ও ঋণের অনুপাত হওয়া উচিত ৪০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারগুলির হওয়া উচিত ২০ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে সমগ্র ভারতের ৯০ বিলিয়ন ঋণ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কারণ ভারতের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য যেমন দিল্লি, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার জিডিপি ও ঋণের পরিমাণ ২০ শতাংশের অনেক বেশি।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে জিডিপি ও ঋণের অনুপাত ৩৯ শতাংশ এবং ঋণের পরিমাণ ৫লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা ১০.১৪ কোটি যা শ্রীলঙ্কার থেকে অনেক বেশি। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হওয়ার সুবাদে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি এখনো সৃষ্টি হয়নি। আবারও প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা এরকম হলো কী করে?

বিগতদিনে দেখা গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক লাভের কথা চিন্তা করে সরকারি অর্থভাণ্ডার ফাঁকা করে বিভিন্ন দান খয়রাতির কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিনামূল্যে ট্যাব, রেশন, কৃষকবন্ধু প্রকল্পে ৫ হাজারের বদলে ১০ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা ইত্যাদি। যা বিগত ১০ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি হ্রাস করেছে। অন্যদিকে এই ধরনের দান খয়রাতির ফলে কোষাগার খালি হয়ে যাওয়ায় ঋণের বোঝা বেড়েছে। বিপদ বুঝেও এইভাবে অর্থ অপচয় বন্ধ করার বদলে ঋণ করেও দান খয়রাতির প্রকল্প বাড়িয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর ফলে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও পেনশন দিতে পারবে কিনা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

কেন্দ্র সরকারও তার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রাখতে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ঋণগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে ঋণ প্রদান করে চলেছে। ফলে কেন্দ্র সরকারেরও ঋণের বোঝা বেড়ে চলেছে। এই রকম পরিস্থিতি থেকে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে গেলে অবিলম্বে দান খয়রাতির সরকারি যোজনাগুলো বন্ধ করতে হবে। অন্যদিকে রাজ্যে শিল্প কারখানা গড়ে তুলে স্থায়ী কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষুদ্র স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এবিষয়ে কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। তাই অবিলম্বে কেন্দ্র সরকারকে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হবে , নাহলে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি হতে আর দেরি নেই।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

জনকল্যাণমূলক অর্থনীতিই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে পারে

ড. জয়ন্ত দত্ত

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। স্বাধীনোত্তর কালে কিছু কলকারখানা স্থাপিত হলেও আধুনিকীকরণের অভাবে এবং রাজনৈতিক কারণে অনেক কারখানাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একটি দেশ তথা রাজ্যের বিকাশ ও উন্নয়ন শুধুমাত্র কৃষিনির্ভর হলে সেই রাজ্যের কর্মসংস্থান ও রাজ্যের আয়ের উৎস কম হতে বাধ্য। বাম জমানার শেষভাগে কিছু বিনিয়োগের উদ্যোগ দেখা গেলেও রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং সঠিক জমি অধিগ্রহণ নীতির অভাবের কারণে সেইসব উদ্যোগ সফল হয়নি। ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক আন্দোলনের ফসল হিসেবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত এই তৃণমূল সরকার। রাজ্য সরকারের ভোটব্যাংকমুখী সস্তা রাজনীতির প্রভাবে আজ এই রাজ্যের মাথার ওপর ৫,৬০,০০০ কোটি টাকা ঋণ। অনুমান করা হচ্ছে এই ঋণের পরিমাণ আগামী ২০২৩ সালের মার্চ নাগাদ ৫,৮৬,৪৩৮ কোটি টাকায় পৌঁছবে। আসল অঙ্ক এর থেকেও বেশি হতে পারে। অর্থাৎ ৬ লক্ষ কোটি টাকার আশেপাশে। বাজার থেকে ঋণ নেবার বৃদ্ধির হার বার্ষিক প্রায় ১১ শতাংশ, যেটা খুবই উদ্বেগের।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু কি পশ্চিমবঙ্গই ঋণ নেয়? উত্তর, অবশ্যই নয়। আমাদের রাজ্য বাদ দিলেও অন্যান্য রাজ্যও বাজার থেকে ঋণ নেয়। কিন্তু দু'একটি বড়ো রাজ্য ব্যাতিরেকে পশ্চিমবঙ্গের ঋণ করার হার অনেক বেশি। রাজ্যে মোট আয়ের (স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গের ঋণের পরিমাণ ৩৮.৮ শতাংশ। রাজ্যের মোট আয়ের শতাংশের হিসাবে রাজ্যের ঋণের পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। চলতি অর্থবর্ষে (২০২২) প্রথম স্থান ও দ্বিতীয় স্থানে পঞ্জাব (৫৩.৩ শতাংশ) ও রাজস্থান(৩৯.৪ শতাংশ)। পশ্চিমবঙ্গের পরেই কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশের (৩৭.৬ শতাংশ) অবস্থান। এই পরিস্থিতিতে যে দুটি রাজ্য ভালো অবস্থানে বিরাজ করছে তারা হলো মহারাষ্ট্র (২০শতাংশ) ও গুজরাট (২৩ শতাংশ)।

মাথাপিছু আয়ের নিরিখেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বেশ নীচুর দিকেই। ২০১৮-১৯ সালের তথ্যানুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ (রাজ্যের মোট জনসংখ্যার হিসাবে) ১,৩৯,৪৯১ টাকা। ছত্তিশগড়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি ব্যতীত আমাদের রাজ্যের অবস্থান অনেকটাই শেষের দিকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাজ্যের এই পরিস্থিতির জন্য কারণগুলি কী?

জমি অধিগ্রহণে সরকারের অসহযোগিতা তথা স্থানীয় শাসকদলের কর্মীদের দাপাদাপির (সিন্ডিকেটরাজ) কারণে শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করতে ভয় পান। এর ফলস্বরূপ কৃষির ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত। কৃষিজমির ওপর প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত (ল্যান্ড ম্যান রেশিয়ো) নির্ভরতা কৃষির উৎপাদনশীলতা কমাতে বাধ্য।

এছাড়াও সরকারি চাকরিতে নিয়োগ না

সিঙ্গুরে পরিত্যক্ত ন্যানো কারখানা এখন গোরুর বিচরণক্ষেত্র।

থাকার কারণে যুবসমাজের মধ্যে হতাশার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ হচ্ছে। চাকুরিজীবী বা অন্য পেশার লোকজনের টাকায় আমাদের বাজার সচল হয়। অর্থাৎ চাহিদার বৃদ্ধি হয়। চাহিদা জোগানের পথ প্রশস্ত করে। এই জোগান বেশি হওয়া মানেই আরও বেশি কর্মসংস্থান। কর্মসংস্থানে পশ্চিমবঙ্গ এই মুহূর্তে বেশ পিছিয়ে। শুধু ভোটব্যাংক রাজনীতির জন্য সিভিক ভলেন্টিয়ার বা চুক্তিভিত্তিক ছোটোখাটো নিয়োগ করলে অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য যে টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে (বার্ষিক ১২,৯০০ কোটি) তাতে কম করে ৩ লক্ষ সরকারি কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যেত, যা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করত। এছাড়াও, এই রাজ্যে ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান ও মেলার আধিক্য সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গে কম আয়ের মানুষের সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। আরও একটি তথ্যে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। করোনাকালীন পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ১৩,৮৪, ৬৯৩ জন। সারা ভারতে যত পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এসেছে তার মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিক ১৩.১২ শতাংশ।

২০২১-২২-এর বিদেশি বিনিয়োগের তথ্যানুসন্ধান করলে দেখা যায়, সারা ভারতে যেখানে ২২,৯৯,২৯৩ মিলিয়ন টাকা বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই বিনিয়োগ মাত্র ১৬, ২৯৪ মিলিয়ন টাকা, যা মোট বিনিয়োগের মাত্র ০.৭০ শতাংশ। সবথেকে বেশি বিনিয়োগ কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও দিল্লি রাজ্যে হয়েছে। শিল্প বিনিয়োগের এই হাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

এবার আসি কৃষির কথায়। ২০১৯ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে কৃষি পরিবার পিছু প্রতি মাসে আয় ৩৯৮০ টাকা। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার এই নিরিখে আমাদের নীচে অবস্থান করছে। পরিবার পিছু বার্ষিক কৃষি আয়ের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের চাষি পরিবার ৪৭,৭৬০ টাকা আয় করে। এই মুহূর্তে (২০১৮-১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী) ভারতের কৃষি পরিবার পিছু বার্ষিক আয় ৭৭,১২৪ টাকা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের গড় আয় জাতীয় কৃষক গড় আয়ের তুলনায় বেশ কম। পরিবারপিছু কৃষি আয়ের নিরিখে প্রথম তিনটি রাজ্য হলো পঞ্জাব, হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীর। রাজ্য সরকারের কৃষকদের আয় বৃদ্ধির হারের দাবি ঠিক বিপরীত মুখে অবস্থান করছে উপরের তথ্যগুলি।

পশ্চিমবঙ্গের মোট উৎপাদিত আলুর একটি বিশাল অংশ (প্রায় ৩৫ শতাংশ) চাষিরা হিমঘরে রাখতে না পারার কারণে কম মূল্যে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। আলু সহজে পচনশীল সবজি। অন্যান্য রাজ্যে আলু পাঠানোর ব্যর্থতাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হিমঘরে জায়গা পাবার জন্য আবার রাজনৈতিক আনুকূল্যও প্রয়োজন। তা থেকে অধিকাংশ প্রান্তিক চাষি বঞ্চিত। ধানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) ধান কেনার জায়গায় শাসকদলের লোকেদের হম্বিতম্বি চোখে পড়ার মতো। যার ফলে প্রান্তিক চাষিরা ধানের সঠিক মূল্যপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই অবস্থা থেকে মুক্তি কীভাবে পাওয়া সম্ভব? এই বিশাল দেনার দায়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কার মতো হবে না তো? যতদিন পর্যন্ত এই রাজ্যের রাজনৈতিক ভাগ্যের পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন এই অবস্থা চলবে। বর্তমানে এই অবস্থা আরও ভয়ংকর হবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সরকারের বিনিয়োগমুখী চিন্তাভাবনা। শিল্প সম্মেলনের নামে রাজ্য সরকার প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে, কিন্তু বাস্তবের রূপ পায় না। এই সমস্যা থেকে বের হতে হলে দরকার ক্ষুদ্র রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে জনকল্যাণমুখী অর্থনীতির প্রয়োগ।

(লেখক কৃষি অর্থনীতির অধ্যাপক)

‘স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম’ শীর্ষক দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশ সংস্কার ভারতীর

গত ১২ এপ্রিল সন্ধ্যায় সল্টলেকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ আয়োজিত ‘স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম’ (Struggles for Freedom) শীর্ষক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। লোকার্পণ করেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী চণ্ডীচরণ দাস।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংবলিত অনবদ্য দলিল এই দেওয়ালপঞ্জী। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ১২টি ঘটনা সংবলিত ১২টি পাতায় সমৃদ্ধ এই দেওয়ালপঞ্জীর তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। প্রচ্ছদ কথা লেখেন অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন। ১২টি ঘটনার চিত্রাঙ্কন করে দেওয়ালপঞ্জীকে আকর্ষণীয় করে তোলেন শিল্পী পিন্টু কর্মকার, চিরন্দীপ মিত্র, দীপক দাস, জয়দেব বণিক, কণাদ দাস, জয়দীপ ভকত ও আদিত্য রায়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ, সুভাষ ভট্টাচার্য, নীলাঞ্জনা রায়, সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, ড. শুভ মজুমদার, অধীর রায়, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. বিজয় আঢ্য, অরুণাভ রায় প্রমুখ।

সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীত সহযোগে নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরিচালনায় ছিলেন মেহেন্দি চক্রবর্তী। এরপর পরিবেশিত হয় সমবেত দেশাত্মবোধক সংগীত ‘ ভারত আমার স্বদেশ আমার’। গানটির রচয়িতা অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য। এরপর ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন বিশিষ্ট অতিথিগণ। সংগঠনের পক্ষ থেকে হাওড়া জেলার আমতা নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী চণ্ডীচরণ দাসকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি বলেন, ‘‘আমি চাই ভারত পুনরায় বিশ্বগুরুর আসন লাভ করুক। বিশ্বকে পথ দেখাক আমার ভারত।’’

অনুষ্ঠানে ‘জীবনব্রতী’ সম্মান প্রদান করা হয় সুকুমার সেনকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তিলক সেনগুপ্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। তারপর আনন্দমঠ নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাট্যরূপ ও সংগীত পরিচালনায় অমিত দে। পরিবেশনায় সংস্কার ভারতী রেপার্টরি। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় ছিলেন ভরত কুণ্ডু। পরিশেষে ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে রাষ্ট্রবন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নরেশ ভবনে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত যোজনা বৈঠক

গত ১০ এপ্রিল কলকাতার নরেশ ভবনে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাতটি জেলার কার্যকর্তা-সহ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমিতির আমন্ত্রিত সদস্য সরোজ কুমার সাহু,

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সহ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে এবং সংগঠনের প্রান্ত টোলির সদস্যরা। শেষে দিব্যাঙ্গ বন্ধুদের হাতে বিশেষ প্রয়োজনীয় কিট তুলে দেওয়া হয়।

করিমগঞ্জ সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ৫ এপ্রিল স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব ও করিমপুর সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাজের নানাস্তরের ৭৫ জন নাগরিককে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে গুণীজন সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। জেলা গ্রন্থাগারে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন বিদ্যাভারতীর কেন্দ্রীয় সংগঠন মন্ত্রী তথা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীরাম আরাওকরজী। উপস্থিত ছিলেন এএসটিসি-র চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, বিদ্যাভারতীর কার্যকর্তা যোগেন্দ্র সিং শিশোদিয়া, বিদ্যানিকেতন পরিচালন সমিতির সভাপতি সাহস রঞ্জন দাস, সম্পাদক সুবীর বরণ রায় এবং প্রধান আচার্য অঞ্জন গোস্বামী।

অসমের বরাক উপত্যকার বিভিন্ন পর্যায়ের ৭৮ জনকে সম্মান জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে ১০৩ বছরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্যামারানি দেবী, বিশিষ্ট কৃষক নিরঞ্জন নাথ, গৃহিণী রূপমালা রায়, গৃহস্থ অসিতরঞ্জন নাথ, সেবিকা পূর্ণিমা দাস, শিক্ষক চিন্ময় নাথ, অধ্যাপক শঙ্কর ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে, অধিবক্তা জ্যোতির্ময় দাস, বিশিষ্ট রাজমিস্ত্রি পবন দেব, কাঠমিস্ত্রি হারান শুক্লবৈদ্য, ব্যবসায়ী নির্মল ভুরা, রজক অরুণ রজক, ক্ষৌরকার বাবুল শীল, বেতশিল্পী সঞ্চিতা নমঃশূদ্র, রংমিস্ত্রি দুলাল দাস, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি নবনী রঞ্জন চৌধুরী, পুরোহিত রেবতীমোহন চক্রবর্তী, সংগীতশিল্পী রঞ্জিত পুরকায়স্থ, বাদনশিল্পী রাজেশ নাথ ও মিহির রায়, নাট্যকার অমিতাভ চৌধুরী, কবি ও সাহিত্যিক ড. গীতা সাহা, সাংবাদিক অরূপ রায়, চর্মকার বিষ্ণু রবিদাস, শ্মশান পরিসেবক শঙ্কর চন্দ, সাফাই কর্মী কাকু হরিজন, ফেরিওয়ালা বিমল পাল, সংবাদপত্র পরিবেশক নির্মল শর্মা, নার্স জয়শ্রীস্বামী দেব, বাহনচালক মিহির রঞ্জন চৌধুরী, রাঁধুনি মিতালি নমঃশূদ্র, ব্যান্ডবাদক মণি শব্দকর, সবজি বিক্রেতা সুভাষ চন্দ্র নাথ, দুধ বিক্রেতা হেলাল জয়শী, ফুল বিক্রেতা প্রবাসী দাস, পুলিশ দীপক দে, বিএসএফ বীরেন্দ্র কুমার সিনহা, ডাকপিয়ন গোবিন্দ পাল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পুবালি পুরকায়স্থ।

মালদহে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে আম্বেদকর জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১৪ এপ্রিল মালদহ সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় আম্বেদকর জয়ন্তী। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি সমাজের পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপ্ত কমলিনী সরেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নিধু মহারাজ, সংস্কৃতভারতীর উত্তবঙ্গ সম্পর্ক প্রমুখ জয় সাহা, ড. নারায়ণী চক্রবর্তী,

শিক্ষিকা ছন্দা ভগিনী, শিক্ষক নারায়ণ মণ্ডল, গৌড় মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক অমিতলাল ঠাকুর, মানিক হালদার, সামসী কলেজের সমাজবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা তপপ্রিয়া রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা মানিক হালদার তাঁর ভাষণে বলেন, ড. বি আর আম্বেদকর সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার রূপ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কিছু কারণবশত তিনি তা করতে পারেননি। সংস্কৃতভারতী আম্বেদকরজীর প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করতে এবং আগামীদিনে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।

হনুমানের জন্মস্থানের খোঁজ মিলল তিরুমালা পর্বতাঞ্চলে

দুর্গাপদ ঘোষ

অযোধ্যায় রামজন্মস্থানে যখন পাঁচ পর্যায়ের বিশাল এবং সুরম্য মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছে ঠিক সেই সময় সন্ধান মিলেছে রামায়ণের অন্য এক বর্ণময় চরিত্রের জন্মস্থানের। তিনি হলেন রামভক্ত হনুমান। গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল একখানা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতিতে। প্রচলিত কথকতা ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, পুরাণ এবং ভৌগোলিক তথ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে লেখা এই গ্রন্থের শিরোনাম হলো 'Evidences of the birthplaces of Lord Anjaneyaswami' —ভগবান অঞ্জনেয়স্বামীর জন্মস্থানের তথ্যপ্রমাণ। এই গ্রন্থ অনুসারে রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের জন্ম হয়েছিল ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসাবে ২৭ এপ্রিল। দিনটা ছিল মঙ্গলবার। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত তিথি-নক্ষত্রের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক প্রতিগণনা বা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছে। সময়কাল নির্ধারণ হয়েছে এখন থেকে ৭ হাজার বছরের কিছু বেশি। প্রসঙ্গত, দেড় দশক আগে 'Dating the era of Lord Ram; শীর্ষক একখানি গ্রন্থ লিখেছেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী পুষ্কর ভাটনগর। গ্রন্থটি বহুল প্রচারিত হয়নি। তার একখানা কপি সংরক্ষিত আছে কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে। তাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যাক ক্যালকুলেশন করে শ্রীভাটনগর রামচন্দ্রের জন্মের যে সময় নির্ধারণ করেছেন, হনুমানের জন্মকালের সময়ও প্রায় একই দেখা যাচ্ছে। এই গ্রন্থ অনুসারে হনুমান রামচন্দ্রের চাইতে বয়সে কিছুটা বড়ো ছিলেন।

গ্রন্থটি প্রকাশের দিন ১৩ এপ্রিল নির্ধারণ করা হয়েছিল এই কারণে সে দিনটা হলো 'উগাদি' বা তেলুগুভাষীদের নববর্ষ। তেলুগুভাষীরা দিনটিকে অত্যন্ত শুভ মনে করেন। গ্রন্থটিতে নানা দিক থেকে তথ্যপাতি উপস্থাপন করে জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছে যে, 'astronomical, epigraphical, scintific and puranic evidences' থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে হনুমান নামে রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রটির বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। তিনি ছিলেন বনাঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কেবল দৈহিক শক্তিতেই নয়, ছিলেন পরম জ্ঞানীও। তাঁর জন্ম হয়েছিল দক্ষিণ ভারতের হ্যাম্পি এলাকা সন্নিহিত তিরুমালা পার্বত্য অঞ্চলে। তিরুমালা পার্বত্য অঞ্চল পাশাপাশি সাতটি পাহাড় গিয়ে গঠিত। তার মধ্যে একটি পাহাড়ের নাম হলো 'অঞ্জনাদ্রি'। এই অঞ্চলেরই অন্য একটি পাহাড়ের নাম তিরুমালা। সেখানে অবস্থিত রয়েছে বেঙ্কটেশ্বরস্বামী বালাজী (বিষ্ণু) মন্দির যা তিরুপতি (ত্রিপতি) মন্দির নামে জগৎবিখ্যাত। এই মন্দিরের সুবাদেই গোটা অঞ্চলকেই সাধারণভাবে তিরুমালা পার্বত্য অঞ্চল বলা হয়ে থাকে।

হনুমান যে দাক্ষিণাত্যের একজন বনবাসী বা এখন যাঁদের ট্রাইব বা জনজাতি বলা হয়ে থাকে সেই সমাজের মানুষ ছিলেন তা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু তিনি ঠিক কোথাকার মানুষ ছিলেন এবং ঠিক কোন এলাকায় তাঁর জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে গবেষণা এবং অনুসন্ধানের কাজ অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে বিধৃত তথ্য অনুসরণ করে রামচন্দ্রের অস্তিত্বের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ

হবার পর পণ্ডিত মহলে রামভক্ত হনুমান যিনি রামচন্দ্রকে তাঁর 'প্রভু' জ্ঞান করতেন, তাঁর সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই সূত্রে আগেই প্রকাশ পায় যে হনুমানের পিতার নাম ছিল বায়ু এবং মাতার নাম ছিল অঞ্জনা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও এখনো মাতৃতান্ত্রিক পরিবার রয়েছে। সেখানে মায়ের নাম থেকে সন্তানদের নামকরণও হয়ে থাকে। বায়ুকে কোথাও কোথাও বিশেষ করে বাংলায় বাতাস বলা হয়ে থাকে। বাতাসের একটি সমার্থক শব্দ হলো পবন। এই কারণে বায়ুপুত্র অনেক জায়গায় পবনপুত্র হিসেবে পরিচিত। প্রাচীনকালের মানুষও সম্ভবত হনুমানের মাতার নাম জানতেন এবং খুব সম্ভব এই ধারণাও ছিল যে ওই অঞ্চলে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়েছিল। সেই সূত্রে তিরুমালা পার্বত্য অঞ্চলের একটি পাহাড় দীর্ঘকাল থেকে অঞ্জনাদ্রি নামে পরিচিত। এই পার্বত্য অঞ্চলে অন্যান্য পাহাড়ের মধ্যে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে বেঙ্কটাদ্রি। এই পাহাড়েই রয়েছে বেঙ্কটেশ্বর বা তিরুপতি বালাজী মন্দির। এছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পাহাড়ের নাম নারায়ণাদ্রি, গরুড়াদ্রি ও শেষাদ্রি।

লোকমুখে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অঞ্জনাদ্রি নামের সূত্র ধরে এখানে বা এর আশেপাশে কোথাও অঞ্জনি-হনুমানের আবির্ভাব ঘটে ছিল কিনা তার বিজ্ঞানসম্মত তথ্যভিত্তিক গবেষণার জন্য তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থম বোর্ডের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কে এস জবাহর রেড্ডির নেতৃত্বে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠিত হয়। তাতে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সনিধানম সুদর্শন শর্মা, জাতীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুরলীধর শর্মা, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের অন্ধ্রপ্রদেশ শাখার ডেপুটি ডিরেক্টর বিজ্ঞানী ড. রেমিল্লা মূর্তি প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিত-গবেষকরা রয়েছেন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আছেন রাজনৈতিক দল তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র মুখপাত্র এন বি সুধাকর রেড্ডিও। গত বছর ১০ এপ্রিল অর্থাৎ উল্লেখিত গ্রন্থের প্রকাশের তিনদিন আগে তিরুপতিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তিনি রীতিমতো প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন, 'There was every posibility to belive that Lord Hanuman was born and raised on Tirumala hills'— তিরুমালা পার্বত্য অঞ্চলে ভগবান হনুমানের জন্ম হয়েছিল এই বিশ্বাসের পিছনে সমস্ত রকমের সম্ভাবনা বিদ্যমান। রেড্ডি আরও জানান যে এক সময় এলাকাটি ছিল গভীর বর্ষারণ্য (rain forest) এবং সেখান থেকে লঙ্কার শাসক রাক্ষসরাজ রাবণ মা সীতাকে অপহরণ করেছিলেন।' প্রথমত, উত্তর ভারতের বেশিরভাগ জায়গায় তিনি বায়ুপুত্র হনুমান ছাড়াও 'বজরঙ্গবলী' হিসেবেও পরিচিত। রাজস্থানের মতো কোথাও কোথাও 'আঞ্জনি' নামও শোনা যায়। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র অধিক পরিচিতি 'আঞ্জনেয়স্বামী' নামে। এর একটা বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে, মহর্ষি কামবান রচিত তামিল রামায়ণ 'রামাবতারম'-এ অনেক জায়গায় হনুমানকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখিত গবেষক কমিটি টানা তিন মাস ধরে নিরন্তর গবেষণা ও অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করার পর গ্রন্থটি প্রণয়ন করে 'উগাদি'-র মতো পবিত্র দিনে তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন।

হনুমানকে নিয়ে এত গবেষণা, তথ্যাদি সংগ্রহ, পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ইত্যাদির জন্য এত বড়ো বড়ো শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, গবেষক, বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এত বেশি আগ্রহী হলেন কেন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে। এই কেন-র উত্তর খুব ভালোভাবে তাঁরাই দিতে পারবেন যাঁরা রামভক্ত হনুমানের জীবনচরিত পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন, তাঁকে জেনেছেন, বুঝেছেন, আত্মস্থ করেছেন। রামায়ণের পাঠক মাত্রেই, তিনি যাঁর লেখা যে ভাষায় যে রামায়ণই পাঠ করে থাকুন না কেন, জানেন যে হনুমানের মতো অনুগত ও আত্মনিবেদিত ভক্ত পৃথিবীতে বিরল। হনুমানের ভক্তি, নিঃসীম বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, তাঁর অনুগত্য অতুলনীয়। রামচন্দ্র তাঁর কাছে দেবতুল্য প্রভু, সীতা তাঁর কাছে মাতা ছাড়া কিছু নন। কেবল শারীরিক শক্তিতেই নয়, আরও অনেক দিক থেকেই তিনি ছিলেন অসীম গুণবান, নিরহংকারী জ্ঞানী। অবতাররূপী বিনয়ী। ১৪ বছরের বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বনবাসী জনজাতির মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরন্তর তাঁদের সঙ্গে আহার-বিহার করেছেন। বনবাসীরাও রামচন্দ্রের মহান চরিত্র এবং করুণাময় অন্তরাত্মার সঙ্গে নিজেদের জীবনকে একীভূত করে দিয়েছেন। সেই সব বনবাসী নর বা 'বানর' অভীধার মানুষদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন হনুমান। কালের প্রবাহে আজ তাঁর পরিচয় কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। যেখানেই রাম-সীতা সেখানেই তাঁদের চরণাশ্রিত হনুমানের বিগ্রহ। অপরিসীম প্রভুভক্ত হনুমান ছাড়া রাম-সীতার মূর্তির যেন কল্পনাই করা যায় না। এছাড়া পৃথকভাবে মন্দিরে মন্দিরে হনুমানের বিগ্রহ পরম শ্রদ্ধায় পূজিত হচ্ছে। উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় রামচন্দ্রের করুণায় দক্ষিণের জনজাতীয় হনুমান যে কতখানি বিগলিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত আনুগত্য। রামচন্দ্রের যে কোনো ইচ্ছাকেই তিনি নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, নির্দ্বিধায় পালন করে গেছেন। রামচন্দ্রের মতো মহাপুরুষের অনেক বড়ো বড়ো সংকট মোচনে সহায়ক হয়েছেন। সে রাবণের লঙ্কায় সীতামায়ের সন্ধান করা হোক, লঙ্কায় যাবার জন্য রামেশ্বরমে সমুদ্রের ওপর সেতুবন্ধন করা হোক কিংবা শক্তিশেলে জ্ঞান হারানো লক্ষ্মণের জন্য গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী নিয়ে আসা হোক। অবলীলায়, বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোনো কিছু করতেই পরোয়া করেননি। মহাভারতের অর্জুনও ছিলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পরম অনুগত। কিন্তু রামায়ণের হনুমানের সঙ্গে মহাভারতের অর্জুনের যদি তুলনামূলক আলোচনা করা হয় তাহলে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্জুনের কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণানুগত্য প্রশ্নাতীত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন।

অন্যদিকে হনুমানের রামভক্তি রামানুগত্য ছিল একেবারে প্রশ্নাতীত। অর্জুন কৃষ্ণের কথায় অনেক কিছু করেছেন। হনুমান রামের কথায় সবকিছু করেছেন। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আস্থা ছিল যে তাঁর প্রভু সর্বজ্ঞ, সর্বময়। রামচরিতমানস রচয়িতা গোস্বামী তুলসীদাস এমনি এমনি ভারতের অধ্যাত্মিক নগরী বারাণসীতে হনুমানকে মহিমান্বিত করার জন্য সংকট মোচন মন্দির স্থাপন করেননি। আজ সারা পৃথিবীর কথা বাদ দিলেও ভারতবর্ষের মধ্যে কটা বা আদৌ কোনো অর্জুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না এই নিবন্ধকারের জানা নেই। কিন্তু ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম এমনকী উত্তর পূর্বাঞ্চলেও অসংখ্য মন্দিরে হনুমান স্বমহিমায় বিরাজ করছেন। রামনবমীর মতো হনুমান জয়ন্তীও সর্বত্র পালন করা হচ্ছে। হনুমানের রামানুগত্য ছিল পরিপূর্ণভাবে ভক্তিরসে জারিত, সুধাভাণ্ডের মতো পবিত্র অমৃতময়, যা মানবতাকে মহত্ত্বের দিকে নিয়ে যাবার অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। হনুমানের এই মহত্ত্বের জন্যই তাঁর সম্পর্কে পণ্ডিত এবং বিদ্বৎমহলে এত বেশি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই।

(শ্রীহনুমান জন্মমহোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

পুরুকে দেখে আলেকজান্ডার বুঝেছিলেন ভারতজয় অসম্ভব

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

হিন্দু জাতির শৌর্য বীর্যের ঐতিহ্যময় ইতিহাস আজ আমরা ভুলতে বসেছি। যারা ভারতবর্ষে স্বাভিমান প্রতিষ্ঠার জন্যে মরণপণ সংগ্রাম করে গেছেন আজকের প্রজন্ম তাঁদের বেমালুম ভুলে বসে আছে। অথচ যে সকল হিন্দু বীর যোদ্ধা বিদেশি আক্রমণকারীদের পর্যুদস্ত করে আত্মবলিদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন তক্ষশীলাধিরাজ পুরু।

রাজা পুরু ছিলেন তক্ষশীলা অঞ্চলের ক্ষত্রিয় অধিপতি। তাঁর রাজত্বকালে গ্রিক আলেকজান্ডারই সর্বপ্রথম বহিরাগত আক্রমণকারী হিসেবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিল। আলেকজান্ডারের পিতা ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ। ফিলিপের মৃত্যুর পর আলেকজান্ডার রাজা হন। তিনি ছিলেন অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালিপ্সু। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে তিনি পারস্য দখল করে নিজেকে পারস্য সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। পারস্য এবং প্রাচীন ব্যাবিলন সম্রাজ্যের মতো তিনি অতি সহজে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতের সীমানা ছিল পারস্য অবধি। এই গ্রিকদেরই ভারতীয়রা যবন বলে অভিহিত করতো। অনেকেই মনে করে মুসলমানরাই যবন, কিন্তু তা নয়, মুসলমানদের ম্লেচ্ছ বলা হতো। পারস্য সম্রাট আলেকজান্ডারের নাম পারসি ভাষায় সিকান্দার বলা হয়ে থাকে। এই কারণে মুসলমানরা আলেকজান্ডারের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে ভাবতে শুরু করে তিনি মুসলমান বলেই এমন পরাক্রমশালী ছিলেন। তাই তারা আলেকজান্ডারকে মুসলমান রূপে গণ্য করতো। এবং পারসিকরা আলেকজান্ডারের এই নামকরণে তাদের সন্তানের নাম সেকান্দার রাখতে শুরু করে। আবার তাদের অনুকরণে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের মুসলমানরাও তাদের সন্তানের নাম সেকান্দার রাখে। তাদেরও ভ্রান্ত ধারণা ছিল সেকান্দার অর্থাৎ আলেকজান্ডার মুসলমান ছিলেন। তাছাড়া ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদের জন্ম হয়েছিল আলেকজান্ডারের মৃত্যুরও হাজার বছর পরে। এ থেকেই বলা যায় তিনি কখনও মুসলমান ছিলেন না। সম্রাট আলেকজান্ডার তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ভারত আক্রমণ করে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে। এটাই ছিল ভারতের বহিঃশত্রু কর্তৃক প্রথম

আক্রমণ। সিকান্দার বিনা যুদ্ধে তক্ষশীলা দখল করে এবং রাজা অম্ভি গ্রিকদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। আলেকজান্ডার তার বিশাল বাহিনী নিয়ে ভারতের ছোটো ছোটো রাজ্যগুলো দখল করে নিয়ে ভারত সম্রাট হবার পথে এগিয়ে চলছিলেন।

তৎকালীন ভারতে হিন্দু রাজাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের ছিল না কোনো ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাস। এক সময় আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী রাজা পুরুর রাজ্য আক্রমণ করলে তক্ষশীলার অমিততেজা হিন্দু রাজ পুরু গ্রিক সেনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। উভয় বাহিনী যখন ঝিলম নদীর উভয় তীরে মুখোমুখি হয় ঠিক তখনই শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড় ঝঞ্ঝা। ঝিলমে বান ডাকে। এই সুযোগে আলেকজান্ডার সুকৌশলে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে নদী পেরিয়ে রাজাপুরুর বাহিনীকে পেছনের দিকে আক্রমণ করে। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে রাজা পুরুর সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। আবার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে জল-কাদায় পুরুর সেনাবাহিনীর রথ ও হস্তী প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে এবং আলেকজান্ডারের অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে পিছু হটতে থাকে। কিন্তু এমন বিপর্যয়ের মুহূর্তেও রাজা পুরু একাই নিজে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু এক সময় শত্রু পক্ষের অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে শত্রুবাহিনীর হাতে বন্দি হন। পুরুকে বন্দি করে আলেকজান্ডারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন বন্দি অবস্থায় পুরুকে তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমি আপনার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করবো।' পুরু নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন, 'একজন রাজা হয়ে অন্য একজন রাজার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে থাকেন সেই রূপ ব্যবহারই আশা করি।' আর আলেকজান্ডার একজন পরজিত ও বন্দি ভারতীয় হিন্দু রাজার সাহসিকতাপূর্ণ উত্তরে অভিভূত হয়ে পুরুকে হত্যা না করে তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের অধীনে এই রাজ্যের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন। তবে একথাও সত্য যুদ্ধে পরাজিত হওয়া ছিল পুরুর মন্দ ভাগ্য। আবার এটাও বাস্তব যে, আলেকজান্ডার বুঝতে পেরেছিলেন যদি পুরুকে হত্যা করে তাঁর রাজ্যে কোনো গ্রিক শাসনকর্তা বসিয়ে দেন, তবে ওই রাজ্যের জনগণ ক্রোধ ও ঘৃণায় গ্রিক শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে।

তাছাড়াও তিনি পুরুর আশেপাশে যে সকল ক্ষুদ্ররাজ্য জয় করেছিলেন সে সকল রাজ্যও পুরুর রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে পুরুকে শাসক নিয়োগ করেন। আর পুরু আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেও পরবর্তীকালে সুযোগ বুঝে আলেকজান্ডারকে পরাভূত করে নিজেকে স্বাধীন হিন্দু রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজা পুরুকে পরাজিত করার পর আলোকজান্ডার ঝিলাম ও চেনার নদী পেরিয়ে ব্যাস নদী অতিক্রম করে যৌধেয় জাতি এবং পার্বত্য উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাহসী না হয়ে পশ্চাদপসরণ করে স্বদেশে ফিরে যাবার পরিকল্পনা করেন। তাছাড়া আলেকজান্ডারের রণক্লান্ত ঘরমুখো সৈনিকেরা নতুন ভাবে রাজ্য জয়ে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হয়ে উঠে। আর এই সুযোগে শূদ্রক মালবের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ভয়ংকর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে পড়ে আলেকজান্ডার। এমনকী ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে গ্রিক সেনাদের হাতাহাতি সম্মুখ সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। আর হঠাৎ করে কোনো এক ভারতীয় যোদ্ধার অব্যর্থ শরাঘাতে আলেকজান্ডার আহত হয়ে শয্যাশায়ী হন। যে আলেকজান্ডার ভারতে একচ্ছত্র অধিপতি হবার জন্যে ভারতীয়দের রক্তে হোলি খেলেছিল তাতেও তাঁর স্বপ্ন সফল হয়নি। ভারতের অধীশ্বর হবার ক্ষমতা হয়নি।

অবশেষে ছোটো ছোটো রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তিনি সিন্ধু নদের মোহনায় পৌঁছান। এবং সেখান থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে তাঁর সাম্রাজ্য পারস্যের ব্যাবিলনে ফিরে যান। হতমনোবল হয়ে সেখান থেকে তিনি হিন্দুকুশ ও গান্ধার থেকে তক্ষশীলা ও ব্যাস নদী পর্যন্ত পঞ্চনদের অর্ধাংশ নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দেন। আর রাজা অম্ভিকে তক্ষশীলা এবং পুরুকে পঞ্চনদের শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। রণক্লান্ত হয়ে ভারত বিজয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এবং খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে ব্যবিলন নগরীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে তার সাধের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো উবে গিয়েছিল। ভারতীয় ছোটো ছোটো রাজ্যগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করে গ্রিক আধিপত্যের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি মগধ রাজ্যের সম্রাট রূপে অধিষ্ঠিত হন। সে সময় কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দ। আর তার অন্যতম মহামাত্য ছিলেন আচার্য চাণক্য। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সুদীর্ঘকাল সুশাসক হিসেবে রাজ্য শাসন করে খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮ অব্দে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও ছিলেন পরাক্রমশালী শাসক। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে মারা গেলে তাঁর পুত্র অশোক হিংসাসনে বসেন। সম্রাট অশোক শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নন সারা বিশ্বের নরপতিদের অন্যতম হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হয়ে ভারতের মহান সম্রাট হিসেবে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। □

আন্দামানে সাভারকরকে নিয়ে কনভেনশন

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার ৭৫ বছরের অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে ভারত ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত বিতর্কিত একইসঙ্গে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কলঙ্কিত এক দুঃসাহসিক চরিত্র বিনায়ক দামোদর সাভারকরের যথোচিত মূল্যায়ন নিয়ে তিন দিনের এক কনভেনশন বসেছিল আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। স্থান নির্বাচন যে অসাধারণ তা আর বলে দিতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে সাভারকরের যৌবনের সেরা ১০টি বছর ৪.৭.১৯১১ থেকে ৯.৫.১৯২১ অবধি আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে আন্দামানে জেলের ঘানি টেনে কাটাতে হয়েছিল। সেই জায়গায় তাঁরই জীবনের বীরগাথা উদ্‌যাপনের (সর্বভারতীয় সম্মেলন) পরিকল্পনা করেছিল অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা নতুন দিল্লি। অনুষ্ঠানটির যুগ্ম উপস্থাপনায় ছিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখা। তিন দিনের এই 'জাতীয় সম্মেলনের' উদ্বোধন হয় ৫ এপ্রিল সকাল ১০টায়। দিল্লি থেকে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী সুভাষ সরকার দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটি ছিল পোর্ট ব্লেয়ারের ড. ভীমরাও আম্বেদকর ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি সভাগৃহে। উদ্বোধন পর্বের প্রারম্ভে বিশ্বভারতীর ড. হরেকৃষ্ণ মিশ্রের নেতৃত্বে স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে সংকল্প ও সরস্বতী বন্দনা অনুষ্ঠানের সুর বেঁধে দেয়। প্রেক্ষাগৃহ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। সাভারকর যিনি বদ্ধ কারা-কুঠরিতে মানুষের মুখ-দর্শনে বঞ্চিত থেকে ৫০ বছরে মেয়াদের ১০ বছর রক্তাক্ত অবস্থায় কাটিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে স্থানীয় মানুষ ছিল অপরিজ্ঞাত। একথা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে অকপটে স্বীকার করেন আম্বেদকর ইনস্টিটিউটের কর্তা ড. উৎপল শর্মা। তিনি ইতিহাস সংকলন যোজনা কর্তৃপক্ষকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে সত্য ইতিহাস তুলে ধরার জন্য অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানান।

বন্দেমাতরমের পর সমবেত অতিথিরা দীপ প্রজ্বলনে অংশ নেন। স্থানীয় কার্যকর্তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা বরণ করে নেয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা শুরু করেন পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. স্মৃতি কুমার সরকার ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি হিসেবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপক বক্তৃতায় সাভারকরের নামের মধ্যেই বিনায়ক অর্থে গণেশ ও দামোদর অথে কৃষ্ণের যুগপৎ উপস্থিতির চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দেন। এখানে সাভারকরের মধ্যে জন্ম থেকেই যে দেশভক্তির উন্মেষ ছিল তা বোঝাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 'জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত' অনুষঙ্গটি সাভারকরের জীবনে অঙ্গীভূত থাকার উল্লেখ করেন।

সংস্থার রাষ্ট্রীয় সংগঠনমন্ত্রী ড. বালমুকুন্দ পাণ্ডে বলেন, ইংরেজদের দেশের পার্থিব সম্পদ লুঠ করার থেকেও বেশি ভয়ংকর ছিল জাতীয় স্বাভিমানকে চিরতরে খতম করে দেওয়ার কুঅভিপ্রায়। সাভারকর কিন্তু কখনই হিন্দু-মুসলমানের আড়াআড়ি ভেদাভেদের কথা না বলে মঠ, মন্দির, বনবাসী সর্বশ্রেণীর মানুষের একতার কথা বলেছেন। মুকুন্দজী পরাধীন ভারতের সেই সময়ে যেন স্বর্গ হতে দেবতাদের পৃথিবীতে ক্রমাগত আগমনের বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ শ্রোতাদের আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। এ কারণেই তো বোধহয় শুধু পড়া নয় পড়াশোনা বলা হয়। সেখানে আবার শোনানোর প্রক্রিয়ারও যে ভূমিকা থেকে যায় তা দারুণভাবে প্রমাণ করলেন

ফঃ ৫

মন্ত্রী সুভাষ সরকার। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের ডেকে তারা পরাধীন থাকলে কী করত এক কথায় বলতে বলেন। তুমুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তিনি বিশেষ করে লক্ষ্মীবাঈ, অহল্যাবাঈ হোলকার, রানি চেনাম্মারা যে আজও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত তা মনে করিয়ে দেন।

এই সূত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার না হতে পারার আক্ষেপ মেটাতে সত্য ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের কথা বলেছেন তা স্মরণ করিয়ে দেন। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের এই আয়োজন তাই খুবই সময়োপযোগী। তিনি বিশেষ করে তিলক, লালা লাজপত রায়, রাজগুরু, ভগৎ সিংহ, সুখদেব প্রভৃতির ভূমিকার সঠিক ইতিহাসের রচনার কথা বলেন। শ্রী সরকার যারা স্বাধীনতার বছরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে জন্মেছেন তাদের 47 born.ajadi 75gmail.com. এই ঠিকানায় ৩টি ফটো পাঠাতে বলেন। সংস্থার অস্থায়ী সভাপতি ড. দেবী প্রসাদ সিংহ সাভারকরই যে প্রথম দেশকে পিতৃভূমি বলতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তা মনে করিয়ে দেন।

এদিকে বিশেষ সারস্বত অতিথি আন্দামান নিকোবরের বিভাগীয় কার্যকর্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ড. অমিতাভ দে আক্ষেপ করে বলেন ইংরেজের চাবুকে ক্ষতবিক্ষত সাভারকরকে মানুষের মধ্যে সাহেবদের সহায়ক বলে বামপন্থীরা লাগাতার প্রচার চালিয়েছে। অথচ তখন তিনি বিলেতে ফ্রি ইন্ডিয়া সোস্যাইটি করছেন, অভিনব ভারত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মদনলাল ধিঙড়া তাঁরই দীক্ষিত, যিনি সাহেব হত্যা করলেন। এর পরই সাভারকর ভারতে চালান হলেন। অসমসাহসী সাভারকর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় ফ্রান্স সীমান্তের দ্বীপে ঝাঁপ দিয়েও অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারলেন না। ঠিকানা হলো সেলুলার জেল। ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপ, তেজ, তারুণ্য প্রভৃতি যে গুণাবলীর কথা বাজপেয়ীজী সাভারকর সম্পর্কে ব্যক্ত করেছিলেন সেই সব জানা-অজনা তথ্যের উচ্চারণে সভাস্থলে এক জাতীয়তাবাদী অনুরণনের যেন প্রতিধ্বনি শুরু হয়েছিল।

কমলেশ দাস সঙ্ঘ প্রচারক এরপর অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ধন্যবাদের মাধ্যমে প্রথমপর্বের সমাপ্তি টানেন। দ্বিতীয়ার্ধে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট সাভারকর বিশেষজ্ঞরা তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন আলোকিত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অংশ নেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃশান রাও, অধ্যাপক হরিহর পাণ্ডা, ড. শুভজিৎ চৌধুরী, সচ্চিদানন্দ মিশ্র প্রমুখ। অ্যাকাডেমিক সেশন এদিনের মতো শেষ হতেই কাছে পিঠে আন্দামানের দ্রষ্টব্য দেখার পালা। সব শেষে ইতিহাসের মলিন পৃষ্ঠা থেকে জীবন ফিরে পেল সাভারকর, উল্লাসকর দত্তদের জীবনের কালাপানির নির্মমতম অধ্যায়। সেলুলার জেলে দেখানো হলো লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রদর্শন। সাভারকরের জেলে অনশন ও বন্দিদের সংগঠিত করার, জীবনবাজি রাখা চেষ্টা ও ইংরেজের নির্যাতনের রূপ দর্শকদের বিবশ করে দেয়।

দ্বিতীয় দিন ৬.৪.২২-এর শুরুতেই সাভারকরের সংগ্রাম তীর্থ সেলুলার জেলে যাওয়া হয়। তিন তলার সর্বশেষ কুঠরিটিতে একটি বাড়তি লোহার গেট দিয়ে তাঁকে রাখা হতো। সকলেই সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে শ্রদ্ধা জানান। সাভারকর যেখানে গলায় জোয়াল বেঁধে সরষে থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল না বার করতে পারলে চাবুক খেতেন তারও একটি প্রতিরূপ ছিল। সম্মেলনের প্রায় ৩০ জন বিদগ্ধ সাভারকর গবেষক ছাড়াও আরও কিছু মানুষ ছিলেন সকলেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। এমন একটি দেশপ্রেমিক তাঁর নিজের দেশেই পরিত্যাজ্য এই বোধ ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

ফিরেই শুরু হলো দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন। ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক অরুণা সিনহা, সিদ্ধার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সচ্চিদানন্দ চৌবে, তামিলনাড়ু সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগবান সাহু, কুচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. কার্তিক চন্দ্র সূত্রধর। এঁরা অনেকেই এঁদের সাভারকরের ওপর তৈরি বিশেষ গবেষণাপত্রগুলি পাঠ করে শ্রোতাদের মধ্যে নতুন নতুন তথ্যের ভাণ্ডার খুলতে থাকেন।

পরের অ্যাকাডেমিক সেশনে নেতৃত্ব দেন নব নালন্দা মহাবিহারের উপাচার্য অধ্যাপক বৈদ্যনাথ লভ। সঞ্চালনা করেন গৌহাটি আইআইটি-র সহ রেজিস্ট্রার শুভজিৎ চৌধুরী। তিনি তাঁর গবেষণা পত্রে নেতাজী, রাসবিহারী বসু ও সাভারকর এই তিনজনের মধ্যে তথ্য দিয়ে একটি যোগসূত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। আরও ছিলেন বিএইচইউ-এর ড. জয়লক্ষ্মী কল, ড. সুচিত্রা শর্মা ও সুদূর মণিপুর সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা অধ্যাপক শ্রীমতী মিনা দেবী। এর আগে কাশী বিদ্যাপীঠের উপাচার্য ড. পৃথ্বীশ নাগ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সাভারকর লিখিত গ্রন্থগুলির নাম ও বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন। আমরা কজন জানি ৩৭ খণ্ডে সাভারকর প্রায় ১০ হাজার পাতায় তাঁর দেশ ভাবনা, দর্শন ও ভারত ইতিহাস নিয়ে লিখে গেছেন। সে জন্যই ইতিহাস সংকলন যোজনার কেন্দ্রীয় ভাবনা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা, দেশ, জীবন, রাজনৈতিক দর্শন ও দেশবাসীর মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকার।

এদিনের শেষ খণ্ডের গবেষণা পত্র পাঠের পরিচালিকা ছিলেন অধ্যাপিকা সুমন জৈন। গবেষণা পত্রগুলি পাঠের মাধ্যমে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন ড. বিক্রম কেশরী মহাপাত্র, করুণাকর সাহু, ড. বিষ্ণু মোহন পাণ্ডা ও ড. নীহারিকা লভ। একই বিষয়ের ওপর বক্তাদের সংখ্যাধিক্যে পুনরাবৃত্তি কিছু থাকলেও গবেষকদের আন্তরিকতা ও সাভারকর নিয়ে এযাবত স্বল্পচর্চিত বিষয়গুলি শ্রোতাদের কাছে কখনোই ক্লান্তিকর মনে হয়নি।

৭ এপ্রিল ছিল সমাপ্তি অধিবেশন। এদিন সাভারকর চর্চায় যোগ দেন সদানন্দ চৌবে। তিনি বলেন, অধ্যাপক হিসেবে তিনি তরুণদের মধ্যে সত্য ইতিহাস জানার তীব্র কৌতূহল নজর করেছেন। তাদের বোঝাবার সময় এসেছে ভারত কোনোদিনই পুরোপুরি পরাধীন হয়নি। হাজার বছর পরাধীনতার পরও আমরা আমাদের সংস্কৃতি, স্বকীয়তাকে নষ্ট হতে দিইনি।

স্থানীয় স্কুল কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিচিত্র ধারার নাচগান পরিবেশনের মাধ্যমে সেই সত্যকেই প্রমাণ করল। সাভারকর স্মরণ সম্মেলনে দ্বীপভূমির অন্তর্গত দূরের হ্যাভলক দ্বীপে জাহাজা যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছিল ৮ তারিখে। সেও এক রমণীয় অভিজ্ঞতা। এতগুলি লোককে নিয়ে ঠিক সময়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে তাদের সুবিধে অসুবিধেতে নজর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংকলন সমিতি অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছে। তরুণ রাজীব কুণ্ডু অনুষ্ঠান সফল করতে দীর্ঘদিন আন্দামানে ছিল। ফিরতি পথে অনেকেরই মনে পড়ছিল সাভারকরের সহবন্দি তাঁর ভাই গণেশ সাভারকরের জেল দেওয়ালে শোভিত 'মত কহো ইসে কালাপানী তুম শুনো ইঁয়াহা কি ধরতি কে কণ কণ সে গাথা বলিদানী'। চক্ষু তখন অশ্রুসজল। □

ভ্রমণ

পাখি পাহাড়ের ছবি দেখে অবাক হতে হয়

অমিত চৌধুরী

সুদীর্ঘ চাকুরি জীবনের অবসরের পর সস্ত্রীক পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হুগলি ভ্রমণের ইচ্ছা হলো। সঙ্ঘের এক প্রচারক বলতেন যে স্বয়ংসেবকদের সুযোগ হলেই জেলার বিভিন্ন স্থান বিশেষত ধর্মীয়, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন করে অনুভব গ্রহণ করা উচিত। কেননা দেশকে নিয়ে আমাদের ভীষণ আবেগ জড়িয়ে আছে।

সেই মতো গত ২১ ফেব্রুয়ারি বহরমপুর থেকে বেরিয়ে পড়লাম অযোধ্যা পাহাড়ের উদ্দেশে। পুরুলিয়া চক্রধরপুর এক্সপ্রেস ট্রেনে হাওড়া থেকে পৌঁছালাম বরাভূম স্টেশনে। সেখান থেকে চলে এলাম প্রথমে বলরামপুর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাসে। সেখানে স্নানাদি সেরে স্বল্পাহার করে বেরিয়ে পড়লাম অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে। ছাত্রাবাসে দিলীপ মাহাতো ও সুনির্মল বেসরা ও অন্যান্যদের আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম। সাদামাটা স্বল্পাহার ছাত্রাবাসেই তৈরি কিন্তু কী সুন্দর আন্তরিকতা আশ্রমের কার্যকর্তাদের। কিছু আশ্রমিক ছাত্রের সঙ্গে কথা হলো যারা অধিকাংশই আমাদের জনজাতি ভাই। হতদরিদ্র পরিবার থেকে এসে আশ্রমে থেকে পড়াশোনা করছে। তাদের সরলতায় আমার স্ত্রী ভীষণ মুগ্ধ ও আপ্লুত হলো। সসম্মানে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চললাম অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে।

ডুয়ার্স ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এত মনমুগ্ধকর স্থান যে আছে তা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া না এলে বুঝতে পারতাম না। অযোধ্যা পাহাড়ে লহরিয়া শিব মন্দির ও রামমন্দিরে পূজা দিলাম। লোয়ারড্যাম, আপারড্যাম খুবই সুন্দর। সীতাকুণ্ড থেকে সর্বদা মাটির ভেতর থেকে জল বেরোচ্ছে দেখে আনন্দ পেলাম। তারপর মার্বেল লেকে ইকোপয়েন্টে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে অবাক হলাম। বামনিঝরনা দেখার মতো। পাখি পাহাড়ও আশ্চর্য। পাহাড়ের গাত্রে পাখির ছবি আঁকা ভীষণ আশ্চর্যের ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যারা করছেন ধন্য সেই

মুকুটমণিপুর জলাধার

শিল্পীরা। তারপর সহস্রাব্দ প্রাচীন ভাঙাচোরা দেউলঘাটা মন্দির দেখে মন ভারাক্রান্ত হলো, কেননা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঐতিহাসিক মন্দিরগুলি ভেঙে পড়ছে। অবশেষে বাঘমুণ্ডির কাছে চরিদা মুখোশ গ্রামে গেলাম ও মুখোশের ইতিহাস জানার পর পুরুলিয়ার স্থানীয় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা পেলাম। বাঘমুণ্ডি কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাসে নির্মীয়মাণ ভবন দেখেও ভালো লাগল।

অযোধ্যা পাহাড়, বাঘমুণ্ডিতে দু’ রাত্রি কাটিয়ে চলে এলাম বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলি হয়ে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের রাউতারা ছাত্রাবাসে। সেখানে রাত্রিবাস করি। ছাত্রাবাস বেশ খানিকটা এলাকা নিয়ে গঠিত। তখন ছাত্রাবাসে ৩৮ জন ছাত্র ছিল। তাদের দৈনন্দিন সব কাজকর্ম দেখলাম। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সঙ্ঘের মতোই সংস্কার এখানে দেওয়া হয়। বিকেলে ছাত্রাবাসে সঙ্ঘের শাখায় গেলাম। শাখায় শারীরিক বৌদ্ধিক কার্যক্রম নিলাম। ভৈরব মার্ডি ছাত্রাবাস প্রমুখ ও নিজেও ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করেছে। অবিভাবকের মতো দায়িত্ব পালন করছেন চিত্ত মাহাতো। ছাত্ররা আমাদের খাবার পরিবেশন করল এবং খাবার পাতা ও উচ্ছিষ্ট তারাই তুলে নিয়ে গেল। ছাত্রাবাসের জনজাতি ছাত্ররা কত সহজ সরল তা না দেখে অনুভব করা যাবে না। এরপর সুতানের জঙ্গল, তালবেড়িয়া লেক দেখে রাত্রিবাস করে পরদিন বিদায়ের পালা। সব ছাত্ররা সসম্মানে বিদায় জানানোর সময় আমাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে দেখি আমার স্ত্রী আবেগে আর চোখের জল ধরে রাখতে না পেরে ছাত্রদের আশীর্বাদ করল। চোখের জলে বিদায় নিলাম। সত্যি বলতে কী এই জনজাতি ছাত্রাবাসে ও তার সংলগ্ন গ্রামে না এলে বুঝতে পারতাম না জনজাতি ভাইয়েরা কী ভীষণ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে। নবরূপী নারায়ণের সেবা, সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে উপরে তুলে আনার কাজ কল্যাণ আশ্রমের মাধ্যমে হচ্ছে দেখে ভীষণ গর্বিত হলাম।

পরদিন চলে এলাম মুকুটমণিপুরে। চিল্কা হ্রদের পর এতো বড়ো জলাধার আমি দেখিনি। দুটি নদীর মিলনস্থল খুবই আকর্ষণীয়, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে চললাম শুশুনিয়া পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের নীচে মন্দির দর্শন করে ভাঙাচোরা ভয়ংকর দুর্গম পথ বেয়ে উঠলাম শুশুনিয়া পাহাড়ে। প্রায় ৭০০ ফুট উঁচুতে উঠে নীচে নেমে এলাম। সম্পূর্ণ উঠতে পারিনি। পাহাড় থেকে নেমে রাস্তায় মধ্যাহ্নভোজ সেরে চললাম মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের উদ্দেশে। টেরাকোটা শিল্পের মন্দিরগুলো দেখে মুগ্ধ হলাম যা মল্ল রাজাদের অসাধারণ কীর্তি। সঙ্ঘের বিল্টুদার সঙ্গ আমাদের খুব উৎসাহিত করেছিল। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই মন্দির সৌধগুলি নির্মিত হয়েছিল মল্ল রাজাদের আমলে। মৃন্ময়ী মন্দির, রাসমঞ্চ, শ্যামরাই মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির, কালাচাঁদ মন্দির, মদনমোহন মন্দির, রাধামাধব মন্দির, গুমগড়, পাথরদরজা, লালবাঁধ আরও কত শত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এই শহরকে কেন্দ্র করে। আর ভালো লেগেছে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন (সংগ্রহশালা) যা এই শহরের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

বিষ্ণুপুরে রাত্রিযাপন করে পরের দিন চলে এলাম জয়রামবাটী, কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের জন্মভিটে দেখতে। এসে উঠলাম ক্ষেত্র প্রচারক রমাদার ভাইপো শান্তদার তাজপুর গ্রামের বাড়িতে। তিনি তার বাড়িতে থাকার জন্য বারবার অনুরোধ করাতে তার অনুরোধ ফেরাতে পারিনি। তাঁর বাবা-মা, স্ত্রী, পুত্র সকলের আন্তরিকতায় আমরা ভীষণ আপ্লুত। শান্তদার মায়ের সঙ্গে আমার স্ত্রী এমন গল্পে মেতে উঠল মনে হচ্ছিল যেন শাশুড়ি-বউমার গল্প। শ্রীরামকৃষ্ণের পৈত্রিক গ্রাম, তাঁর ভাগ্নে হৃদয়রামের বাড়ি, সারদা-মা যেখানে তাঁর ভাইদের নিয়ে স্নান করতে যেতেন সেই আমোদর নদীর ঘাট। মায়ের বাগানবাড়ি দেখে পরের দিন কামারপুকুরে বিশ্বকান্তিদার সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণের বসতবাড়ি, আম্রবৃক্ষ, পাঠশালা, হালদারপুকুর ও অন্যান্য স্থান দর্শন করে ধন্য হলাম। অবশেষে পরের দিন তারকেশ্বর মন্দির দর্শন ও পুজো দিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হয়ে বহরমপুর ফিরে এলাম।

আমাদের দেশ কত সুন্দর ও কতকিছু দেখার ও শেখার আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মায়ের জন্মভিটেয় এসে ধন্য হলাম যাদের জন্য আমাদের সংস্কৃতি আজও বেঁচে আছে। স্বয়ংসেবকদের সহযোগিতা ও সাহায্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাসে না এলে আমার ও আমার স্ত্রীর ধারণা হতো না যে সঙ্ঘ কত মহৎ কাজ করছে। পরিবারের লোকেদের সঙ্ঘের কাজ দেখানো উচিত যাতে সঙ্ঘের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল হয়। সকলকে অনুরোধ সপরিবারে ভ্রমণ করুন ও সঙ্ঘের উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞে শামিল হোন। □

পথশিশুদের মা হতে পেরেছেন সিন্ধুতাই সপকল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশ যে বছর স্বাধীন হলো, তার পরের বছরেই জন্ম সিন্ধু তাইয়ের। স্বাধীন ভারতে জন্মেও অবহেলার গ্লানিতে ঢাকা ছিল তার শৈশব। তখনকার রক্ষণশীল সমাজে মেয়ে হয়ে জন্মানোই ছিল সিন্ধু তাইয়ের অপরাধ। অন্তত সিন্ধুর পরিবার তাই মনে করতো। জন্মের পর পরিবার তাঁর নাম রেখেছিল 'চিন্ডি'। অর্থাৎ ফেলে দেওয়া কাপড়ের একটুকরো অংশ। তেমন অবাঞ্ছিত ভাবেই সিন্ধুর বড়ো হয়ে ওঠা। প্রথামাফিক স্কুল শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়েছিল তাঁকে। নিজের পরিজনদের কাছে একপ্রকার অনাথ হয়ে যাওয়া এই সিন্ধুই একদিন হয়ে উঠলেন সমাজসেবী। পথশিশুদের 'মাদার অব অরফ্যানস'। তাঁর উত্তরণের কাহিনি রুপোলি পর্দার স্ক্রিপ্টকেও হার মানায়।

১৯৪৮-এর ১৪ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা জেলায়, পিম্পরি মেঘে গ্রামে জন্ম হয় সিন্ধুতাই সপকলের। মাত্র ১০ বছর বয়সেই সিন্ধুতাইয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। ২০ বছর বয়সেই তিন সন্তানের মা। চতুর্থ সন্তান গর্ভে থাকাকালীন শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হতে হয় সিন্ধুকে। চালচুলোহীন সিন্ধু একটা পরিত্যক্ত গোয়ালে জন্ম দেয় কন্যাসন্তানের। মাথার উপর ছাদ নেই, দু'মুঠো খাবার নেই। তার মধ্যে সদ্যোজাতকে বাঁচিয়ে রাখার দুশ্চিন্তা। নিরুপায় হয়ে কন্যাসন্তানকে কোলে নিয়ে রেল স্টেশনে, রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করলেন।

জীবন তাঁকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করালো। বহু অনাথ শিশুকে একইভাবে ভিক্ষা করতে দেখলেন। অনাথ পথশিশুদের দেখে সিন্ধুতাইয়ের চোখে জল এলো। ভাবলেন কোনোদিন সামর্থ্য হলে এই অনাথদের জন্য কিছু করতে হবে। তাঁদের মাথায় ছাদ, মুখের অন্ন এবং পরনের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে কাজের সন্ধানে বের হলেন। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের টাকা একটু একটু করে জমিয়ে একদিন অনাথ শিশুদের মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করলেন। অমরাবতী জেলার পাহাড়ি এলাকার চিখলদরায় গড়ে তুললেন আশ্রম। তারপর ঘরহারাদের দেখাশোনার জন্য খুলে ফেললেন নিজস্ব সংস্থা। ভবঘুরে নাবালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাবিত্রীবাঈ ফুলে গার্লস হোস্টেল'। এটাই ছিল সিন্ধুতাই সপকলের প্রথম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। স্কুলের গণ্ডি না পেরোলেও কথাবার্তা গুছিয়ে বলতে পারতেন। তাই তাঁর কথায় ভরসা করে অনেক কর্পোরেট সংস্থাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সবমিলিয়ে ৯টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খুলেছিলেন সিন্ধুতাই। তিনি ছিলেন 'অনাথদের মা'। সারাজীবনে প্রায় ১৪,০০০ অনাথকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পের জেরে জমিহারাদের জন্যও সরব হন সিন্ধুতাই। অমরাবতীতে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজে যখন ৮৪টি গ্রামের জনজাতিদের উচ্ছেদ করা হয়, বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।

জীবদ্দশায় ৭৫০টিরও বেশি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন জীবনযোদ্ধা সিন্ধুতাই সপকল। তাঁর মানবিক কাজের জন্য গোটা দেশ তাঁকে 'মাদার অব অরফ্যানস' নামে চেনে। স্বামী- পরিবার পরিত্যক্তা যে মেয়ে একদিন অসহায় অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকা পাথর দিয়ে নিজেই নিজের গর্ভনাড়ী কেটে সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, অনেকদিন পর তাঁর জীবনকাহিনি ফুটে উঠলো প্রেক্ষাগৃহের পর্দায়। মরাঠি ভাষায় মুক্তি পেল 'মি সিন্ধুতাই সপকল'। পেয়েছেন সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রিও। ২০২১ সালে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার। একবার এক অনুষ্ঠানে সিন্ধুতাই বলেছিলেন, "খিদের জ্বালায় যখন খাবারের খোঁজে পথে পথে ঘুরে বেড়াতাম, তখন বুঝেছি অনাহারে দিন কাটানো কতটা যন্ত্রণার। অথচ এদেশে শয়ে শয়ে মানুষ অনাহারে থাকে। যতদিন ঈশ্বর বাঁচিয়ে রাখবেন তাঁদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়াই হবে আমার প্রথম কাজ।" মুম্বই- এর একটি অডিটোরিয়ামের উপস্থিত অভ্যাগতদের নিজের জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সিন্ধুতাই সপকল বলেছিলেন, "ইয়ে ভি কুছ কম নেহি তেরা দর ছুটনে কে বাদ /হাম অপনে পাস আয়ে দিল টুটনে কে বাদ" । দীর্ঘ ও কঠিন পথ চলার কথা এভাবেই সহজ দুটো পঙ্‌ক্তির মধ্যে ব্যক্ত করেছিলেন সিন্ধুতাই । এখনোও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই ইন্সপিরেশনাল ভিডিয়ো রোজ শেয়ার হয়।

এই বছরের ৪ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সিন্ধুতাই সপকল। তাঁর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে লেখেন, "ডঃ সিন্ধুতাই সপকল সমাজের প্রতি তাঁর মহৎ সেবার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন"।

সবাই বন্ধু

শুধু যে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা নয়, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গের মধ্যেও সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড় ওঠে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এক গভীর জঙ্গলে বাস করত অসংখ্য পশুপাখি। বনভূমি ছোটো হলেও

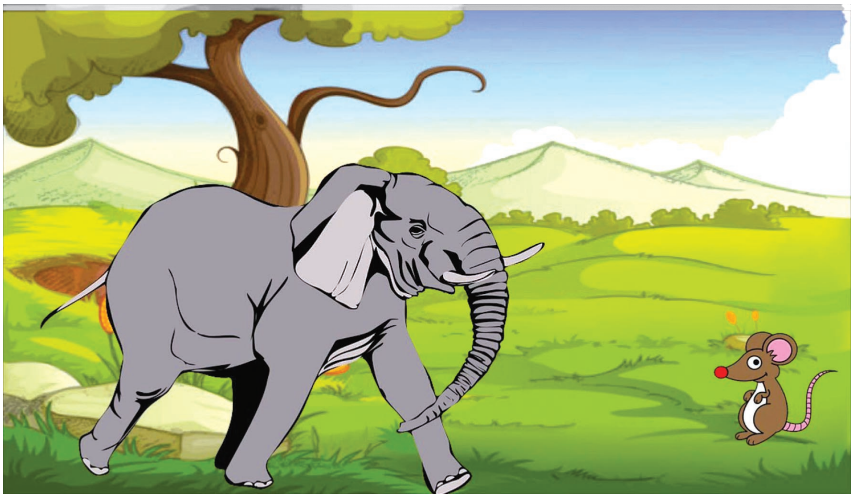

পশুপাখিদের মন ছিল উদার। তারা সবাই সহাবস্থানে থাকতে ভালোবাসে। একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে চেষ্টা করে। পশুরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মায়া মমতাশীল হয়। প্রয়োজনে একে অপরকে কাছে টেনে নেয়। কারও প্রতি তাদের কোনো আক্রোশ নেই। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম ওই বনভূমিতে এভাবেই পশুপাখিরা বসবাস করতে থাকে।

একবার শ্রাবণ মাসের ভরা বর্ষায় মুযলধারে বৃষ্টি। চারিদিক জলে থই থই। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। রাতদিন ঝম ঝম করে শুধু ঝরছে। এরই মধ্যে এক ইঁদুর নিজের গর্তে ছানাপোনা নিয়ে অসহায়ভাবে পড়ে আছে। বেশ কয়েকদিন ধরে পেটে দানা পড়েনি।। ছানাগুলোও উপোস করে আছে। মাঠ-ঘাট জলে ডুবে আছে। খাবারের খোঁজেও নামতে পারছে না। কৃষকেরাও মাঠের ধান কেটে নিয়ে গেছে। ইঁদুর আর ছানাগুলির মরার মতো অবস্থা।

ওই বনে বাস করত এক বিশাল হাতি। বনের পশুরা সবাই হাতিকে মান্য করে। সবাই হাতি মহারাজ বলে ডাকে। কোনো পশুর সঙ্গে দেখা হলেই হাতি মহারাজ তাদের কুশল জানতে চায়। বনে কে কোন অবস্থায় আছে হাতি মহারাজের তা নখদর্পণে। গর্তের মুখে ইঁদুরকে দেখতে পেয়ে হাতি কুশল জানতে চাইল। ইঁদুর তার ক্ষুধার্ত ছানাদের নিয়ে অনাহারে দিন কাটানোর কথা হাতি মহারাজের কাছে প্রকাশ করল।

ইঁদুরের দুঃখের কথা শুনে হাতি খুব দুঃখিত হলো। ইঁদুরকে অভয় দিয়ে বলল, দেখি কী করা যায়। হাতি মনে মনে ভাবছে আমরা বড়ো প্রাণী, জঙ্গলের কলা আর গাছের ডালপালা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করি। কিন্তু ইঁদুর হলো ক্ষুদ্র প্রাণী, ভরা বর্ষায় কোথায় যাবে তারা। এই ভেবে হাতি চলল গ্রামের দিকে। গিয়ে উঠল এক জমিদার বাড়িতে। জমিদার বাড়ির বারান্দায় অনেক ধানের বস্তা রাখা আছে। একটি বস্তা শুঁড়ে করে তুলে নিল। ধানের বস্তা নিয়ে রওনা হলো বনের পথে। গ্রামের মানুষ এই দৃশ্য দেখলেও কারও সাহস হলো না হাতিকে তাড়া করতে। হাতি একেবারে জঙ্গলে এসে ইঁদুরে গর্তের মুখে রাখল ধানের বস্তা। ইঁদুরকে ডেকে বলল, এই নাও বন্ধু, তোমার খাবার। ছানাপোনা নিয়ে বর্ষাটা কাটিয়ে দিতে পারবে। একথা বলেই হাতি নিজের খাবারের সন্ধানে চলল। ইঁদুর তার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে মনের আনন্দে ধান খুঁটে খেতে শুরু করল। হাতির সহানুভূতির কারণে ইঁদুর তার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেল।

এদিকে হাতি খাবারের খোঁজে গিয়ে এক মহা বিপদে ফেঁসে গেল। এক শিকারি হরিণ ধরার জন্য শক্ত জালের ফাঁদ পেতে রেখেছিল। সেই জালে আটকে গেল হাতি। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। এদিতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। নিরুপায় হয়ে সে মরণ ডাক দিতে লাগল। বহু দূর থেকে সেই বৃংহণ কানে এল ইঁদুরের। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে ডেকে ডেকে পশুদের জমা করল। পশুরা গিয়ে দেখল শিকারির জালে হাতি মহারাজ আটকে রয়েছে। কারও কোনো কৌশল কাজে আসছে না। ইঁদুর বলল চিন্তা করো না বন্ধুরা। আমরা তো আছি।

ইঁদুরের দল লেগে পড়ল ফাঁদের জাল কাটতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জাল কেটে হাতি মহারাজকে মুক্ত করল। হাতি বেরিয়ে এলে ইঁদুরকে কৃতজ্ঞতা জানাল। হাতি অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করল ছোটো প্রাণী হলেও ইঁদুর কত বড়ো কাজ করতে পারে। ইঁদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় হাতির চোখে জল এলে গেল। সেই দিন থেকে বনের পশুপাখির মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা আরও বেড়ে গেল। হাতি সবাইকে ডেকে বলল, বনের আমরা কেউ কারও শত্রু নই। আমরা সবাই বন্ধু।

দুলাল চন্দ্র শীল

ভারতের বিপ্লবী

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস ঢাকার ব্রাহ্মণ গাঁয়ে হলেও তাঁর জন্ম পিতার কর্মস্থল হায়দরাবাদে। তিনি মাদ্রাজ থেকে প্রবেশিকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আইসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত যান। সেখানেই বীর সাভারকরের প্রভাবে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। লন্ডন ও প্যারিসের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা ও প্রচারকার্য চালানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পরে সোভিয়েত দেশে গিয়ে কমিউনিস্ট কার্যকলাপে যোগ দেন। সেখানেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জানো কী?

- অষ্টম শতাব্দীতে মল্লরাজ রঘুনাথ মল্লর সময় থেকে বাঁকুড়া জেলা মল্লভূম নামে পরিচিত হয়।
- বাঁকুড়া জেলায় চিনামাটি, চুনাপাথর, আকরিক লোহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়।
- ঝিলিমিলি অরণ্য, শুশুনিয়া পাহাড়, মুকুটমণিপুর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানের জন্য বিখ্যাত বাঁকুড়া।
- দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, শিলাবতী নদী বাঁকুড়া জেলার প্রধান নদী।
- বিখ্যাত পোড়ামাটির ঘোড়ার হস্তশিল্প তৈরি হয় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে।

ভালো কথা

কাকের ভাত

আমাদের বাড়িতে দুপুরে খেতে বসার আগে একটা থালায় কিছু ভাত তরকারি রাখা হয়। আমরা খেতে শুরু করলেই দুটি কাক এসে ভাত তরকারি খেয়ে যায়। কোনোদিন ওদের জন্য দিতে ভুলে গেলে ওরা একসঙ্গে কা কা রবে ডাকতে শুরু করে। মা সঙ্গে সঙ্গে থালায় ভাত তরকারি রেখে আসে। কাকেদের দেকাদেখি কয়েকদিন থেকে কয়েকটা চড়াইও আসতে শুরু করেছে। চড়াইগুলো সারাদিন ধরে শুধু ভাতগুলিই খায়। চৈত্রমাস থেকে ঠাম্মি আবার ওদের থালার কাছে একটা পাত্রে জলও রাখতে শুরু করেছে।

কবীন্দ্র রায়, ষষ্ঠশ্রেণী, শিলচর, অসম।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

চড়কের ভক্ত

স্নিগ্ধা মহান্তি, নবম শ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

চড়কপুজোয় বসে মেলা
তিনদিন কত আনন্দ
মা বলে এই গরমেতে
এটাও তো নয় মন্দ।
দাদাই বলে শোন দিদি ভাই
মজার ব্যাপার চড়ক
দিদুন বলে মজার তো বটেই
দূর হয়ে যায় মড়ক।

জেঠু বলে চড়কেতে সাজতে হয় ভক্ত
জেম্মা বলে ভক্ত হওয়া খুবই কিন্তু শক্ত।
কাকাই বলে প্রতিবারে আমি হই ভক্ত
ছোড়দা বলে সাধনাটা করতে হবে পোক্ত।
বাবা বলে ভক্ত হওয়া খুবই ভালো কথা
মানুষের দূর হয় যত দুঃখ ব্যথা,
ভাবছি বসে পরের বারে ভক্ত যদি হই
শিবের নাচন নাচবো আমি তাথৈ তাথৈ।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

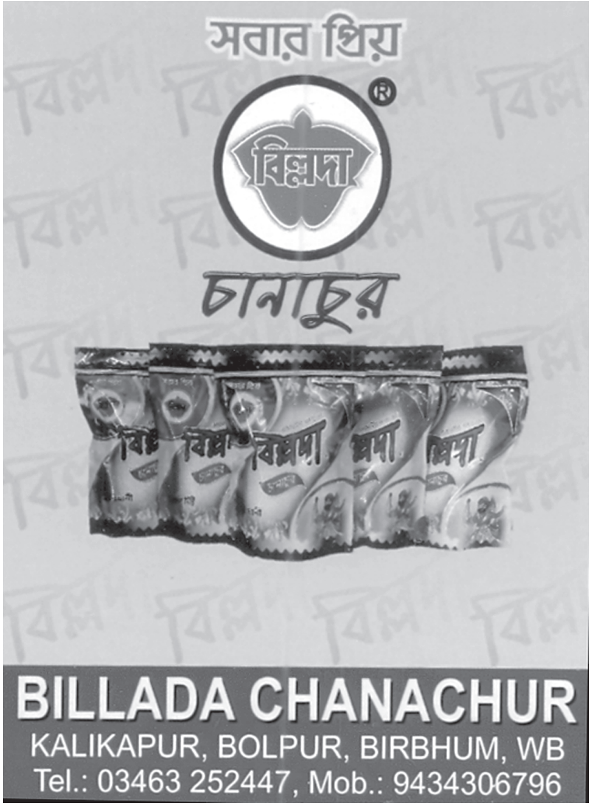

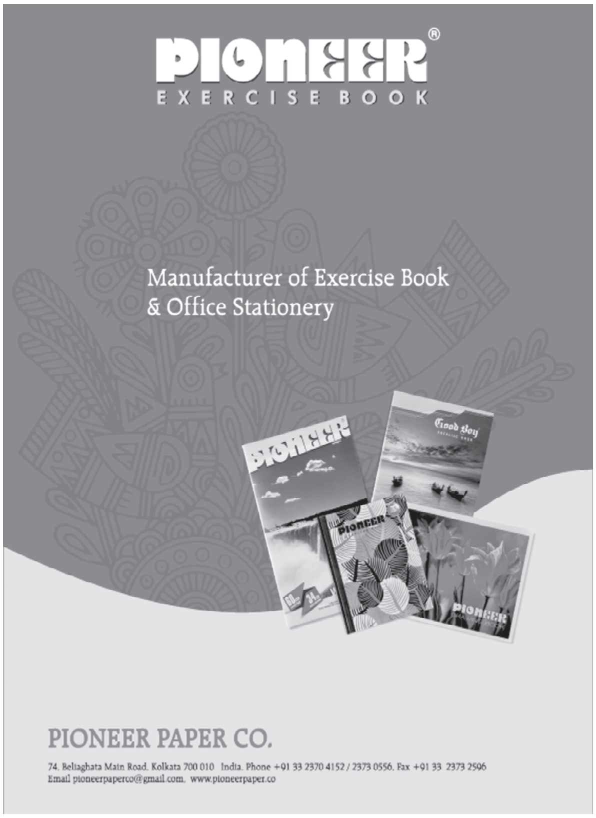

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

মুসলমান ও জনজাতিদের রাজনৈতিক জোট চাননি আম্বেদকর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মুসলমান রাজনীতি এবং ইসলাম সম্পর্কে আম্বেদকরের চিন্তাধারার দিকে নজর দিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে তিনি কখনই তপশিলি সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের রাজনৈতিক জোট করার পক্ষে ছিলেন না।

আম্বেদকর স্পষ্টভাবে বলেছেন (দশম অধ্যায়, 'পাকিস্তান বা ভারতের বিভাজন'), 'মুসলমানরা মনে করে যে হিন্দু ও মুসলমানদের চিরকাল সংগ্রাম করতে হবে— হিন্দুরা মুসলমানদের উপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং মুসলমানরা হিন্দুর উপর শাসক সম্প্রদায় হিসেবে তাদের ঐতিহাসিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে সংগ্রাম করতে। এই সংগ্রামে যারা শক্তিশালী তারা জয়ী হবে...। অন্য দেশগুলোতে মুসলমানরা তাদের সমাজের সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছে, কিন্তু ভারতে মুসলমানরা তা করতে অস্বীকার করেছে, কারণ অন্য দেশগুলো (হিন্দু-মুসলমান) সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ থেকে মুক্ত, ভারত তেমনটি নয়।'

মুসলমান রাজনীতিবিদ, মৌলবি এবং তাদের সমাজের সংস্কার কার্যের অনীহাকে তীব্র আক্রমণ করে ড. আম্বেদকর আরও যোগ করেছেন, 'মুসলমানদের কাছে নির্বাচন একটি নিছক অর্থের ব্যাপার এবং কদাচিৎ তা সাধারণের উন্নতি ও সামাজিক কর্মসূচির বিষয়। মুসলমান রাজনীতি বিশুদ্ধ সেকুলার (পন্থনিরপেক্ষ) জীবনধারার কোনো খেয়াল রাখে না, যথা, ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য, পুঁজি ও শ্রম, জমিদার ও ভাড়াটে, মৌলবি ও সাধারণ মানুষ, যুক্তি ও কু-প্রথা। মুসলমান রাজনীতি মূলত মোল্লাকেন্দ্রিক এবং শুধুমাত্র একটি পার্থক্য স্বীকার করে। তা হলো হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের। সেকুলার শ্রেণীর কোনো স্থান নেই মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবন ও রাজনীতিতে এবং যদি-বা এক-আধটা তথাকথিত সেকুলার বিষয় থাকে তবে বুঝতে হবে তার কারণ অবশ্যই সেটি আন্তর্জাতিক মুসলমান রাজনীতির স্বার্থ যুক্ত কোনো বিষয়। মুসলমানদের এই মন্দ দিকটি যথেষ্ট পীড়াদায়ক। কিন্তু আরও সুদূরপ্রসারি ও চিন্তাজনক হলো নিজ সমাজ সংস্কারের কোনো সংগঠিত আন্দোলন নেই ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যাতে তাদের সামাজিক ব্যাধিগুলো নির্মূল করা সম্ভব। হিন্দুদের সামাজিক কুফল আছে। কিন্তু তা উপশমের ব্যবস্থাও আছে। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে তাদের সামাজিক কু-রীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন সক্রিয়ভাবে সেগুলো অপসারণের জন্য আন্দোলন করেছেন। অন্যদিকে মুসলমানরা তাদের রীতি-রেওয়াজের যা খারাপ তা বুঝতে পারে বলে মনে হয় না এবং তা অপসারণের জন্য আন্দোলন করে না। বস্তুত, তারা তাদের অভ্যাসের যে কোনো পরিবর্তনের বিরোধিতা করে।

ড. আম্বেদকরের উপরোক্ত বক্তব্য ও আরও অনেক লেখার আলোকে এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে যদি কোনো নেতা বা দল দলিত-মুসলমান সমন্বয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি বা সেই দল আম্বেদকরের উত্তরাধিকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন।

কংগ্রেসের কথা ধরা যাক। কংগ্রেস ড. আম্বেদকরকে দল থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। তারপর ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বম্বে কেন্দ্রে এবং ১৯৫৪ সালের উপনির্বাচনে ভাণ্ডারা কেন্দ্রে ড. আম্বেদকর যাতে হেরে যান তার জন্য ষড়যন্ত্র করে। দল

থেকে পদত্যাগ করার পর ড. আম্বেদকর সংসদে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তপশিলি জাতি ও জনজাতিদের সঙ্গে কংগ্রেসের এই বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি কতটা আঘাত পেয়েছিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫১ নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার পর ড. আম্বেদকর সংসদে বলেছিলেন (আম্বেদকরের লেখা, খণ্ড ১৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩১৭-১৩২৭) : '...তপশিলি জাতিদের কেন কোনো ত্রাণ দেওয়া হয় না? মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য যে দরদ সরকার দেখায় তার তুলনা করুন। প্রধানমন্ত্রীর পুরো সময় ও মনোযোগ মুসলমানদের স্বার্থ সুরক্ষায় রক্ষায় নিয়োজিত...। আমি যা জানতে চাই তা হলো মুসলমানরাই কি একমাত্র মানুষ যাদের সুরক্ষা প্রয়োজন? তফশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং ভারতীয় খ্রিস্টানদের সুরক্ষার প্রয়োজন নেই? এসব সম্প্রদায়ের জন্য তিনি কতটা মনোযোগ দিয়েছেন? যতদূর জানি এখনও এই সম্প্রদায়গুলির প্রতি মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি যত্ন ও মনোযোগ প্রয়োজন।'

ফ ঃ ৬

বাংলাদেশের স্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো বাদ দিলে কেমন হয়?

শিতাংশু গুহ

হৃদয় মণ্ডল বিজ্ঞানের শিক্ষক। দশম শ্রেণীতে ক্লাসে শিক্ষার্থীরা দাবি করে যে, বিজ্ঞানের উৎপত্তি কোরান থাকে এবং নবি মুহাম্মদ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। শিক্ষক বললেন, 'ধর্ম ও বিজ্ঞান দু'টি আলাদা বিষয়। ধর্ম থেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়নি। বিজ্ঞান প্রমাণিত সত্য, আর ধর্ম হলো বিশ্বাস। বর্তমানে বিশ্বে বিজ্ঞানীদের নব্বই শতাংশ ইহুদি ও খ্রিস্টান, তারা কোরান পড়েন না।

শিক্ষার্থীদের মনে হলো স্যার হয়তো 'ইসলাম ও নবির' অবমাননা করেছেন। তাঁরা প্রধান শিক্ষকের কাছে গেল। হেডস্যার বিজ্ঞানের শিক্ষককে তিনদিনের জন্যে সাসপেন্ডের কথা বললেন, ছাত্ররা অখুশি হয়ে মিছিল বের করলো, বাইরের মানুষ তাতে যোগ দিতে বেশি সময় লাগলো না। স্লোগান উঠলো— 'হৃদয় মণ্ডলের ফাঁসি চাই; মালাউনের ফাঁসি চাই'।

ঘটনা মুন্সীগঞ্জের বিনোদপুর রামকানাই উচ্চ বিদ্যালয়ের। সময়টা মার্চ ২০২২। এরপর পরই সামাজিক মাধ্যমে একজন অপর্ণা চক্রবর্তী লিখেছেন, 'স্কুলের চাকুরিটা ছেড়ে দিলাম। আমি বিজ্ঞান পড়াই। মানুষের উদ্ভব এককোষী থেকে কেন হবে? কোরানে তা লেখা নাই, আপনি ভুল জানেন ম্যাডাম। আমি চেষ্টা করেছি চাকরিটা ছেড়ে দেবার, নাহলে ধর্ম অবমাননার দায়ে ফাঁসিয়ে দেবে'।

জান্নাতুল ফেরদৌস কলি লিখেছেন, আমি কখনোই ধর্মীয় বিষয় বলতে চাই না, বায়োলজি পড়াই, কন্ট্রাডিকশন হয়েই যায়। চেষ্টা করি সমভাবে এগুতে। কী আছে আল্লাহই জানেন। চাকুরিটা থাকে কিনা, তবে এখন থেকে আরও সতর্ক হবো। বইয়ের বাইরে কোনো তথ্য দেয়া যাবে না। আগে নিজে বাঁচি, পরে ছাত্র। শিক্ষার্থীদের বিদ্যা দেওয়ার আর ওদের বিদ্যা নেওয়ার দিন শেষ, এখন শুধু চাকুরি বাঁচানো'।

ভাবছিলাম, আমরা যখন দশম শ্রেণীতে পড়তাম তখন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তো দূরের কথা, হেডস্যার বা অন্য স্যার বাড়িতে এসে নালিশ করলেও উলটা ফল হতো। আর এখন ছাত্ররা ওত পেতে থাকে শিক্ষককে ধরার জন্যে। হৃদয় মণ্ডলের বক্তব্য নাকি টেলিফোনে হয়েছে। কলেজে ডারউইনের মতবাদ পড়াতে গিয়ে শিক্ষক ধর্মের গুণগান করেননি, তাতে ছাত্ররা নাস্তিক হয়ে গেছে বা ধর্ম খতরাতে পড়েছে।

ইসলাম রক্ষার নামে একাত্তরে যাঁরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই রাজাকার। ইসলাম খতরে মেঁ হ্যায়, ধর্মের বা নবির অবমাননা জাতীয় বিষয়গুলোর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নেই, রাজনীতির সঙ্গে থাকতে পারে। ধর্ম যখন রাজনীতিতে বা রাজনীতিতে ধর্ম, তখন এসব ঘটে। আর সরকার যখন এর পৃষ্ঠপোষকতা করে দেশ তখন গোল্লায় যায়।

ঢাকার ইনকিলাব (৩০ মার্চ ২০২২) পত্রিকার 'ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পাকিস্তানে শিক্ষিকাকে গলা কেটে হত্যা'। ব্লাসফেমির অভিযোগে দুই ছাত্রী শিক্ষিকার গলা কাটে। এখানে নিহত ও হত্যাকারী একই ধর্মের। সেই অর্থে হৃদয় মণ্ডলের কপাল ভালো। হৃদয় বণিকের মতো আর একজন শিক্ষক লিখেছেন, 'আমি হিন্দু, শিক্ষক। শিক্ষকতা করতে ভয় হচ্ছে, কখন যে ফাঁসিয়ে দেয়'।

বাংলাদেশে 'ফাঁসিয়ে দেওয়া'টাই মুখ্য। এখানে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ বা সরকারের প্রয়োজনে। ধর্ম জিনিসটা এতটা ঠুনকো নয় যে কেউ কিছু লিখলে বা বললে তার অবমাননা হয় বা বিপদগ্রস্ত হয়। ধর্ম নিয়ে দেশে যতটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে, তাতে বোধহয় বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই। এই অধঃপতন তখনই বেশি হচ্ছে, যখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের প্রগতিশীল সরকার ক্ষমতাসীন।

নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামল ভক্তের কথা মানুষ ভুলে যায়নি। শ্যামল ভক্ত থেকে হৃদয় মণ্ডল বা আরও কত শিক্ষক বা মানুষ ধর্ম অবমাননার ভুয়া অভিযোগে লাঞ্ছিত হচ্ছেন সেই হিসাব কে রাখে? যেদেশে ধর্মীয় অনুভূতির নামে বারবার শিক্ষক লাঞ্ছিত হচ্ছেন, সেদেশে শিক্ষিত সমাজ আশা করা বোকামি। গোল্লায় যাক শিক্ষা, জাতি মূর্খ থাকুক। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলো মাদ্রাসায় পরিণত করা হোক।

দেশে হিন্দু শিক্ষকরা আতঙ্কে আছেন, হিন্দুরা আতঙ্কে আছেন। শুধু কি হিন্দুরা, নাকি পুরো জাতি আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছেন? বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামি মোল্লাবাদীদের ভয়ে পুরো দেশ, সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল সবাই আতঙ্কগ্রস্ত। সবাই আপোশ করছেন। মুখে বলছেন, 'দেশের মানুষ মোল্লাবাদী নন, ধর্মভীরু— এ কথা বলে মোল্লাবাদকে প্রশ্রয় এবং নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ভালো কথা হলো হৃদয়বাবু জামিন পেলেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের দাবি তাঁর ওপর থেকে মামলাও প্রত্যাহার করা হোক।

(লেখক নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি)

বন্দি জীবনে রামায়ণ ছিল বারীনের নিত্যসঙ্গী

দীপক খাঁ

শুরুতেই কনিষ্ঠের সঙ্গে অগ্রজের সম্পর্ক সামনে আনার কারণ অরবিন্দের ছত্রছায়ায় বারীন্দ্রের বেড়ে ওঠা এবং সেই আশ্রয়েই থেকে যাওয়া। মাঝখানে পড়ে আছে এক ঝোড়ো সময়ের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস। বারীন্দ্র ঘোষের দুটি লেখা যা পাঠকের চোখে পড়েছে তা হলো : (১) বারীন্দ্রের আত্মকাহিনি, (২) সন্ত্রাসবাদীর প্রতি।

বারীন্দ্রের আত্মকাহিনি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। এই রচনার প্রথম অংশে এক চঞ্চলমতির চরিত্র পরিস্ফুট হয়। যার কর্মকাণ্ডের ঝোড়ো হাওয়ায় 'ধর্ম' ও 'বিপ্লব' পাঠকের কাছে একেবারে গুলিয়ে যায় আর এই গোলমালে লেখক আজীবন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরেছেন। আলোচ্য রচনা মুক্তি সংগ্রামীদের অন্দরমহলের অনেক অজানা ঘটনাকে সে প্রকাশ্যে এনেছে--- একথা অস্বীকার করা যাবে না। তাঁদের ভাবালুতা, পরিকল্পনার অভাব, সুদৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলার অক্ষমতা ইত্যাদির ব্যাপারে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ চলতেই পারে। বিশেষত সুরাট কংগ্রেসের উদ্ভট কাণ্ডকারখানা আমাদের শিহরিত করে। তবুও এইসব সত্যভাষণের নেপথ্যে মুক্তিসংগ্রামীদের ত্যাগ ও সাহসিকতার প্রতি যে শ্রদ্ধার মনোভাবটি থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল, এই রচনায় একমাত্র বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ছাড়া তা কারো প্রতি ব্যক্ত হয়নি। বিশেষত মারাঠীরা কেবল বাক্যেই কাজ সারেন, Armchair leader-এর অঙ্গুলিহেলনে সমস্ত বিপ্লব পরিচালিত হয়— এই সব অসম্মানজনক বক্তব্য লেখকের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই সন্দেহ জাগায়। বরেণ্য বিপ্লবীদের চরিত্র চিত্রণে যে লঘু শব্দের প্রয়োগ এই রচনায় করা হয়েছে, তা তীব্র সমালোচনার যোগ্য। লেখক 'অপরাধ স্বীকার কেন করিলাম'--- এই প্রবন্ধটির মধ্যে 'অপরাধ' স্বীকারের কোনো কারণকেই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারেননি। জেলের মধ্যে রাজসাক্ষীকে হত্যার অনন্য নজির সৃষ্টি

করেছেন যে কানাই, সত্যেন, তার পুরো পরিকল্পনাটি বারীন্দ্র অগোচরে রেখেছিলেন— পাঠকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে— কেন?

১৯৩৬ সালে 'সন্ত্রাসবাদীর-প্রতি' 'ভারত কোন পথে?' নামক রচনার নির্বাচিত কিছু অংশকে সংকলিত করে রচিত একটি গ্রন্থ। এখানে আমরা আরও অচেনা এক বারীন্দ্রকুমারকে পাই, যার কাছে গুপ্ত বিপ্লব সমিতির সূচনা— 'ইতিহাসের এক অন্ধকার যুগ'। তার মতে বিপ্লবীরা হলেন হীন গুপ্তঘাতক ও পরাস্বপহারী। বিপ্লবীরা যদি সুগঠিত রাজশক্তিকে সত্যি ভাঙতে পারতেন, তাহলে 'ভারতকে বহু আগেই কলিকাতার মেছো বাজারের একদল গুন্ডা স্বাধীন করে দিত'। বারীন্দ্রের বক্তব্য কিছু ধনী মানুষ দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করতে বিপ্লবী দলকে অর্থ দিয়ে গুন্ডার মতো ব্যবহার করছেন, ওভাবে কেবল বিপর্যয় আসে, স্বাধীনতা নয়। দেশে যখন দারিদ্র্যের সমস্যা, ধর্মীয় হানাহানির সমস্যা এবং নারীজাতির প্রতি অসম্মানের সমস্যা, বিপ্লব তখন সদর্থক পথ দেখাতে পারে না। কমিউনিজম বা গান্ধীবাদ এক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু করতে নিতান্তই অক্ষম। বারীন্দ্রের উল্লেখযোগ্য দাওয়াই— ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। তিনি অভিভাবকের গাম্ভীর্যে জাতীয় কংগ্রেসকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন--- 'আজ দিন এসেছে যখন কংগ্রেসকে ও দেশের রাজশক্তিকে পরস্পরের সহযোগিতা হোক, পৃথক পৃথক বা পাশাপাশি হোক, জাতি গঠনের কর্ম-পদ্ধতি ছকে তা সফল করে তুলতেই হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তখনকার আমি লেখনী ধরছি, কারণ যে দেশ রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিয়েছে, সেই বাঙ্গলার ছেলে-মেয়েদের হীন গুপ্তঘাতক ও পরাস্বপহারী বলা, দেশে আমি সত্যি সত্যিই অন্তরে ব্যথা ও লজ্জা পাই। ধিক শতোধিক বারীন্দ্র ঘোষের এই মানসিক দাসত্বের! প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী জাতীয় আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা প্রেরিত আখ্যায় ভূষিত করাকে।

এবার একটু পশ্চাৎদিকে আমাদের দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করা যাক। তাঁর নিজের কথায় : ''অথচ তাঁর সেজদা (অরবিন্দ ঘোষ) সাতটি পত্রে বারীন্দ্রকে বুঝাইবার প্রয়াস করিলেন যে— আমার (বারীন্দ্রের) ক্রিয়া সাধনার অবস্থা শেষ হইয়াছে। এখন সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ সমর্পিত না হইলে আর উন্নতি হইবে না। আমি এই সাতটি পত্রের উত্তরে তাহার সহিত কত তর্কই না করিলাম। সাধনা তখন আমার এক সাধের সংসার, তাহার গর্ব ও মোহ আমায় পাইয়া বসিয়াছে। এখন আমার সে বুদ্ধি, সে উপরের জ্ঞান নাই যাহা দিয়া বুঝিব যে দু-দশটা সাধনা পাইলে পরম পুরুষার্থ হয় না। নীচের প্রকৃতি উপরের অঙ্গের চাপে যখন বশে থাকে তখন মনের আঙিনায় কত কী দিব্য ভাব ও বিভূতি খেলিয়া যায় বটে। কিন্তু নীচের প্রকৃতি জাগিলে সেই মলিন রিপুর মানুষ। সেই জ্ঞান না থাকিলেও একদিন অন্তর্দশা হইতে জাগিয়া হঠাৎ প্রাণ মনের অশুদ্ধি, মলিনতা দেখিতে পাইলাম, ব্যাপারটা সেইভাবে বুঝিলাম না, বুঝিলাম ভক্তিরই চোখে। তখন মনে জাগিল রূপ গোস্বামীর কথা— যার স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান আছে,

যার নিজের দেহ প্রাণই সার, তার গোপীপ্রেম— শুদ্ধ প্রেম হয় না। আমার হঠাৎ মনে জাগিল যে প্রবৃত্তির হাত হইতে উদ্ধার হইতে আমার জ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে। এই অবস্থা লইয়া আমার আন্দামান যাত্রা।”

তিনি আরও লিখেছেন— ‘আমার সারা আন্দামান জীবন একখানি বইকে সম্বল করিয়া জ্ঞানের সাধনায় কাটিয়াছে। বইখানি যোগ-বশিষ্ঠ রামায়ণ, মাঝে মাঝে শঙ্করের বইগুলি ও পঞ্চদর্শী পড়িতাম। কিন্তু প্রায় চার পাঁচ বছর আমি অন্য কোনো বই পড়ি নাই। উপেন তখন শঙ্করবিদ্বেষী, সে রাগ করিয়া বলিত, ‘ও বইখানা পুড়িয়ে ফেল’। আমি কোনো কথা শুনিতাম না। পরের কথা ও শোনার রোগ আমার কোনোদিনই ছিল না। জ্ঞান বিচারে অনেক ব্যাপার ঘটিল, চোখের সামনে সূক্ষ্ম জগৎ খুলিল— যাহা এই বাস্তব জগৎ অপেক্ষাও সত্যতর, উজ্জ্বলতর জীব ও জগৎচিত্র দিবারাত্র যখন তখন দেখিতাম তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা মনে পড়িল— ‘যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।’ জ্ঞান বিচারে আমার রিপুর শক্তি মরিয়া আসিল, যৌন গাম্ভীর্য অভ্যাস হইল, মনকে তার বিষয়াসক্তি হইতে স্বেচ্ছায় টানিয়া ফিরাইবার বল জন্মিল আর ক্রমে শুখাইয়া আসিল প্রেম, স্নেহ, মমতা, দয়া আদি সব কোমল বৃত্তি। জগতে সকলেই মায়া, তবে আর কীসের কী? বামে, দক্ষিণে, ঊর্ধ্বে, অধোঃ অখণ্ড ব্যোম বা জলরাশি জ্ঞান করিতে করিতে এবং প্রান্ত গম্ভীর শীতল মগ্ন আনন্দ উপর হইতে নামিয়া আসিল, আমি বুঁদ হইয়া সেই অটল শান্তির মাঝে বসিয়া থাকিতাম। মোটের উপর বুঝিলাম— ভগবান সত্য, আমি তাহাকে দেখি নাই বটে, কিন্তু তাহার বহু বিভূতি অনুভব করিলাম— বুঝিলাম এই জগৎই সব নয়। মানব জ্ঞানের মাঝে পর্দার পর পর্দা, লোকের পর লোক, ধামের পর ধাম আছে— একটি সূক্ষ্মকণার মাঝে চর্তুদশ ভুবন দুলিতেছে।’

পরক্ষণেই লিখছেন : ‘তাহার পর দ্বীপান্তরের শেষ বৎসর আমার সাধনা ফুরাইয়া গেল যেন এতবড় অন্তর্মুখী গতি কোথায় পাথরে বাধিয়া গেল, আমি শুষ্ক, ভাষাহীন, নীরস জীবনে ভাসিয়া উঠিলাম, লুপ্ত, ক্ষীণ, প্রবৃত্তি, কামনা সব আমার কোথা হইতে মাথা তুলিতে লাগিল। এতদিন লাগিয়া গেল ওই একটি কথা বুঝিতে— সকল ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া অরবিন্দের সমর্পণ যোগের জন্য প্রস্তুত হইতে। এই বৎসরের প্রারম্ভে আমার মন প্রাণ ভরিয়া এই ধ্রুব বিশ্বাস জাগিয়া উঠিল যে, আমি জেল হইতে মুক্ত হইব। কারাজীবন আমার ফুরাইয়াছে, তপোভূমি ভারত আবার টানিয়াছে। গীতার সেই কথার স্মরণ হইল— ‘নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি’।

দ্বীপান্তর হইতে ফিরবার কয়েকমাস পর প্রথমরার মাত্র ছ’ দিনের জন্য পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন। ‘সেবার কিছু বুঝিনি কারণ তখন কাজ আমায় আবার পেয়ে বসেছে। দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন তিন-চার মাসের জন্য— সেইবার নতুন সাধনার আস্বাদ পেয়েছিলেন, ফলে তার সাধনার গতি, ধারা, ছন্দ তার জীবনে আবার পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁর কথায় : ‘আমি যখন আন্দামান থেকে ফিরে এসে ১৯২৩ সালে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যোগ সাধনা করছি, তখন দুটি ছেলে চাটগাঁর রেল কম্পানির লুণ্ঠিত দশ হাজার টাকা সেখানে শ্রীঅরবিন্দকে দিতে এসেছিল— তারা শীঘ্রই ধরা পড়বে, এত কষ্টের টাকা যার হাতে গচ্ছিত রাখবে সেই-সেই টাকা আত্মসাৎ করবে। এই ভেবে মন্দের ভালো হিসেবে অরবিন্দকে দিতে এসেছিল। আমার (বারীনের) মুখে এই সংবাদ পেয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেন— বারীন, সাবধান— এই টাকা পাপের টাকা, নিও না, এর পিছনে আছে এক অশুভ শক্তির ছায়া। এইসব অর্থে সাধনাশ্রম গড়া দূরে থাকুক— কোনো সৎ কাজেই হতে পারে না। তারা নিরাশ হয়ে ভবানীপুরে একদল বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রেখে ধরা পড়ে যায়। সেই টাকায় পরে সেই বন্ধুর দোতলা বাড়ি উঠেছে, তা আমি জানি।

আসলে তাঁর মতাদর্শ হলো— ‘দেশকে লুণ্ঠন করে দেশের সেবা করার মতো নির্বুদ্ধিতা এবং হটকারিতার মতো কাজ আর নাই’। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী : যুগান্তরের দল গুপ্তহত্যার মতো ডাকাতি, লুণ্ঠন ও দেশের ধনীর অর্থ বল প্রয়োগে গ্রহণ সমর্থন করতো ঠিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বের জন্য, তখন দেশে অরাজকতা আনবার জন্য। দেশবাসীর সর্বস্ব সাধারণ চোর-ডাকাতের মতে অপহরণ করে দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারানো, এ দলের মত কখনও ছিল না। আপদ্ধর্ম হিসেবে ধনীর টাকা বা অর্থবান ব্যবসায়ীর টাকা যা কেড়ে নেওয়া হবে— তা দেশে স্বরাজ স্থাপিত হলে প্রত্যার্পণ করা হবে— এটাই ছিল আমাদের ধারণা। গর্ভমেন্টের ট্রেজারি লুণ্ঠন অবশ্য বিপ্লবীদের চোখে আমরা বৈধই মনে করতাম কিন্তুর ঢাকার অনুশীলন দল ও অন্যান্য দলেরা যে হীন রাহাজানি ও গৃহস্থের সর্বস্বপহরণ আরম্ভ করল, যে কেবল সরকারি অর্থলুণ্ঠন করা কঠিন ব্যাপার বলেই। অনুশীলন দলের দ্বারা এই হীন চেষ্টা সফল হবার পর থেকেই আর দেশ হিতব্রতী ও সাধারণ চোর-ডাকাতে কোনো পার্থক্যই রইল না। এই পাপের টাকা হয় গেছে বেশ্যালয়ে অথবা গেছে স্বার্থপরের উদরে কিংবা গেছে মোকদ্দমায় উকিল, ব্যারিস্টারের পকেটে। আন্দামানে থাকতে আমরা দেশে পাঁচহাজার টাকা তুলিয়ে কোনো একজন নির্বাসিতের ভাইয়ের হাতে রেখেছিলাম। সে টাকা আমাদের কাজে লাগে নাই। কলেজ স্ট্রিটের খুব বড়ো একখানি বইয়ের দোকানে সে টাকা আজও মূলধন হিসেবে খাটছে। এইসব অর্থের চিরদিনই এই পরিণাম। কারণ এ সাধনায় সাধ্য নাই, সাধনা নাই, হিসেব নাই, পদ্ধতি নাই আছে শুধু শান্ত নীরবতা, অনন্ত বিশ্বাস ঊর্ধ্বমুখে আপনাকে মেলিয়া ধরিবার অপেক্ষা। এ সাধনার সাধক মানুষ নয়, মানুষের আধারে ভগবানের শক্তি। মানুষ যদি সমর্পণে চুপ করে আর প্রাণ মন চিত্ত ভরিয়া সায় দেয়, তাহা হইলে সে শক্তি জ্যোতির তরঙ্গে, শান্তির জোয়ারে, জ্ঞানের ছন্দে নামিয়া সব আপনি করিয়া লয়। তাহার পর সবচেয়ে বড়ো কথা, এ সাধনা জীবনের সাধনা, পরমে ও ঐহিকে এক সোনার সেতু, খণ্ড মানুষকে ধীরে ধীরে বৃহতে তুলিয়া ভগবানের আনন্দে সমাসীন করিয়া তাঁর ঐশ্বর্যেপূর্ণ করা, মানুষকে দেবতা করিয়া গড়া— to divirise man”।

কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তিনি যে বলেছেন— এই হীন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রামী বিপ্লবীদের অসামান্য ত্যাগ মলিন হয়ে গেল— তারা দেশের মানুষের শ্রদ্ধা হারালো। শ্রদ্ধা সত্যিকারের তাঁরা হারিয়েছে কিনা জানা নেই, প্রমাণ— ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, মাতঙ্গিনী হাজরা, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র, ভগৎসিংহ, চন্দ্রশেখর আজাদ, বিনয়, বাদল, দিনেশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখরা। □

কোভিডে এদেশে মৃতের পরিসংখ্যান নিয়ে হু-র তথ্য-কারচুপি

কোভিডে এদেশে মৃতের সরকারি সংখ্যা পাঁচ লক্ষ বাইশ হাজার। অন্যদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-য়ের মতে এই সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ পেরিয়েছে। এনিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নামার মতো রাহুল গান্ধী মাঠে নেমে পড়েছেন। খবরে প্রকাশ হু-র পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করে আমেরিকার এক শীর্ষ দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে সরকারি পরিসংখ্যানে কোভিডে যত পরিমাণ মৃতের সংখ্যা দেখানো হয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। বলা বাহুল্য, এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি রাহুল গান্ধী। মার্কিন দৈনিকের এই প্রতিবেদনের স্ক্রিনশট দিয়ে টুইটে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন মোদী সরকারকে। এখন প্রশ্ন, হিসেবের এতো গরমিল হলো কেন?

কেন্দ্রের তরফ থেকে সঠিকভাবেই হু-র গণনার পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সেইসঙ্গে এও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, সরকারি পরিসংখ্যানে শুধুমাত্র কোভিডে মৃতের পরিসংখ্যানই উল্লেখ করা হয়। কোমর্বিডি অর্থাৎ কোভিডের কারণে অন্যান্য শারীরিক সমস্যা জটিল হয়ে মৃত্যু হলে সেটা সরকারি পরিসংখ্যানে নাও উল্লিখিত হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এখনো পর্যন্ত কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ অর্থাৎ গত বছর এপ্রিল-মে নাগাদ এই মারণ-ভাইরাস সবচেয়ে বিপজ্জনক আকার নিয়েছিল।

এই বিপজ্জনক আকার নেওয়ার পেছনে সম্ভাব্য জোরালো কারণ ছিল, দেশজুড়ে তখনো ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়া পুরোদমে চালু হয়নি। বয়স্কদের ক্ষেত্রে নামমাত্র সবে শুরু হয়েছিল। যে রাজ্যগুলো কোভিডের এই দ্বিতীয় ঢেউয়ে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল তার মধ্যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গ ছিল। এখনো তালিকার দিকে চোখ রাখলে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক কোভিডে মৃতের তালিকায় প্রথম দুটি স্থান অধিকার করেছে দেখা যায়। সামান্য পেছনে হলেও পশ্চিমবঙ্গও তাতে আছে। অর্থাৎ কোভিডের আচমকা দ্বিতীয় ঢেউ এসে পরিস্থিতি শোচনীয় করে তুলেছিল। সমগ্র বিশ্বেই এই দ্বিতীয় ঢেউ মারাত্মক আকার নিয়েছিল। তবে ভারতে জনপরিসংখ্যানের নিরিখে এই মারাত্মক আকার অবশ্যই ভয়াবহ হয়েছিল। আর এদেশে তো রাজনীতি ব্যতিরেকে কিছু হয় না। সেই রাজনীতির সুবাদেই যমুনা তীরে লাশ পোড়ানো, কিংবা উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার জলে লাশ ভাসিয়ে দেওয়ার মতো গুজব রটেছিল। সেই ভেসে আসা লাশ আটকাতে এরাজ্যে মালদার কাছে গঙ্গায় প্রহরাও বসানো হয়েছিল। কিন্তু লাশের টিকিটিরও দেখা মেলেনি। কিন্তু কোভিডের চূড়ান্ত বারবাড়ন্তের মধ্যেও ভারত সরকার ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত কোভিডকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। যে কারণে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কোভিডের তৃতীয় ঢেউ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

ভারতের তুলনায় দ্বিগুণ আক্রান্ত ও দ্বিগুণ মৃত প্রথম বিশ্বের প্রবল ক্ষমতাধর আমেরিকার সুখী না হওয়ারই সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখলেই হু-র তথ্য কারচুপি ভারতবাসী বুঝতে পারবেন। কিন্তু বিরোধীরা ব্যস্ত রাজনীতি করতে।

যে কোনো বিপর্যয়ের মোকাবিলায় সরকারকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে দিতে হয়। এদেশের বিরোধীদের এইটুকু শিক্ষাও নেই। এতে প্রাথমিক বিপর্যয় আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু দৃঢ়চেতা ভারত সরকার অবস্থা সামলে নিতে পেরেছিল। এবং পরবর্তীতে ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়ার সাফল্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে। কোভিডে আমেরিকায় সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। অথচ ভারতের তুলনায় সেদেশে জনঘনত্ব কত কম। জনসচেতনতা খুবই বেশি। ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়ায় সাফল্যও তারা ভারতের মতো অর্জন করতে পারেনি। আর কোভিড যুদ্ধে জেতা মানে কূটনৈতিকভাবে ভারত যে আমেরিকাকে পেছনে ফেলে দেবে এটা বোঝার ক্ষমতাও আমেরিকার আছে।

তাই তাদের নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই তথ্য জালিয়াতি। কোভিডের সঙ্গে কোমর্বিডি, তার সঙ্গে জেনারেল পার্সেপশন মিলিয়ে মিশিয়ে এই চল্লিশ লক্ষের তথ্য 'আবিষ্কার'। ভারতে কোভিড পজিটিভ প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষ, ভারত সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী যদি পাঁচ লক্ষেরও তাতে মৃত্যু হয় তাহলে বলতে হবে আক্রান্তের মাত্র এক শতাংশের মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের যখন এই অবস্থা, তখন ভারতের তুলনায় দ্বিগুণ আক্রান্ত ও দ্বিগুণ মৃত প্রথম বিশ্বের প্রবল ক্ষমতাধর আমেরিকার সুখী না হওয়ারই সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখলেই হু-র তথ্য কারচুপি ভারতবাসী বুঝতে পারবেন। কিন্তু বিরোধীরা ব্যস্ত রাজনীতি করতে। তাই মার্কিন দৈনিকের প্রতিবেদন নিয়ে এতো শোরগোল। কিন্তু দিনের আলোর মতো যাবতীয় মেঘের কালো ছায়া সরিয়ে প্রকৃত সত্য একদিন উদ্ঘাটিত হবেই। □

রামনবমীর শোভাযাত্রায় বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বছর সর্ববৃহৎ রামনবমীর শোভাযাত্রার সাক্ষী থাকলো উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর। সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ইসলামপুর ও ডালখোলায় রেকর্ড সংখ্যক মানুষ সাড়ম্বরে রামনবমী পালন করলেন। ইসলামপুরে রামনবমীর পরিচালনার দায়িত্বে থাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তীয় সহ-সম্পাদক গৌরাঙ্গ তলাপাত্র বলেন, 'তিন লক্ষেরও বেশি মানুষ রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছেন। বিশাল সমাবেশ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসন যথাযথ সহযোগিতা করেছেন।' শোভাযাত্রায় শিশু, কিশোর, মহিলা থেকে শুরু করে সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। এদিন ইসলামপুরের গেস্ট ফার্ম কলোনিতে ভগবান শ্রীশ্রী রামচন্দ্রের পুজোর পরে শোভাযাত্রা বের হয়। কলেজ মোড় দিয়ে ৩১নং জাতীয় সড়ক হয়ে টার্মিনাসের সামনে দিয়ে জীবন মোড়ে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষ হয়। ডালখোলায় অনুকূল ঠাকুরের মন্দির থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়ক দিয়ে লোকনাথ মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট, বুনিয়াদ পুরে রামনবমীর শোভাযাত্রার ব্যাপক জনসমাগম হয়। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদা ও পশ্চিম কোচবিহারের বিভিন্ন স্থানে রামনবমীর পুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোয়।

বীরভূমের তারাপিঠে মায়ের মন্দির সংলগ্ন সাগর মোড়ে এবছরই প্রথম রামনবমীর বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা বেরোয়। উদ্যোক্তাদের অন্যতম তারাপীঠ মন্দিরের সেবাইত পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তারাপীঠে এই প্রথম রামনবমী পুজোর গোড়াপত্তন হলো। বীরভূমে আরও একটা রামনবমী পুজো বাড়লো। এর আগে রামনবমী পালন করা হতো না'। দ্বারকা নদীতে ঘট ভরতে যাওয়ার সময় পাঁচটি হরিনাম সংকীর্তনের দল যোগ দেয়। স্থানীয় কার্যকর্তা ও স্থানীয় উৎসাহী মানুষ ঘট নিয়ে নগর পরিক্রমা করেন। রামপুরহাট রেল ময়দানে রামনবমী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে রামপুরহাট মহকুমা ভিত্তিক রামনবমী অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। পুজানুষ্ঠান শেষে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় ৬ হাজার লোকের সমাগম হয় রামপুরহাটের শোভাযাত্রায়। পুজো এবং শোভাযাত্রা এখানে নির্বিঘ্নেই পালন হয়। এছাড়া বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া, সিউড়ি, দুবরাজপুর, নলহাটি, বোলপুর ও ময়ূরেশ্বরে জাঁকজমকের সঙ্গে রামনবমী পালন হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের বুড়োর ঘাট রামমন্দিরে এবারও রামনবমীর বিশেষ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। বুড়োর ঘাট থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডেই পরিক্রমা করা হয়। প্রায় তিন হাজার মানুষের সমাগম হয় এখানে। শান্তিপূর্ণ ভাবেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

কলকাতায় ভবানীপুর, যাদবপুর, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, শোভাবাজার বড়োবাজার, মানিকতলা-সহ বিভিন্ন এলাকায় রামনবমী পালন হয়। পশ্চিম বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডে অনুষ্ঠিত রামনবমীর পুজোয় স্থানীয় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তারা জানান অন্যান্য বারের তুলনায় এবারে বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

রাজনীতির রং ভুলে মানুষ এখানে শোভাযাত্রায় পা মেলান ও জয় শ্রীরাম ধ্বনি দেন। এই পুজোয় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের যুব বিজেপির সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। গত দু'বছর কোভিডের কারণে রামনবমীর পুজো তেমন জাঁকজমক ভাবে করতে পারেননি বাঙ্গলার মানুষ। তাই এ বছর সর্বত্রই দারুণ উৎসাহের সঙ্গে মানুষ রামনবমী পালন করেন। বাঁকুড়া ও হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির সৃষ্টি হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা আক্রান্ত হন। এছাড়া সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবেই রামনবমী পালন হয়েছে। □

মোদী জমানায় অতিদরিদ্রের সংখ্যা প্রায় শূন্য, বলছে বিশ্বব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বর্তমান কেন্দ্র সরকারের ইতিবাচক নীতির সুফলে ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতে এক ধাক্কায় অনেকটা কমেছে দরিদ্র সংখ্যা। বিশ্বব্যাঙ্কের এক গবেষণাপত্র বলছে এই আট বছরে দেশে দরিদ্র জনসংখ্যা কমেছে ১২.৩ শতাংশ। বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকাশিত ওই গবেষণাপত্রে লেখকরা দাবি করেছেন, ২০১১ থেকে ১০১৯ পর্যন্ত দেশের গ্রামাঞ্চলে অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা শহরের তুলনায় অনেক দ্রুত হারে কমেছে। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের হার কমেছে প্রায় ১৪.৭ শতাংশ। ২০১১ সালে গ্রামীণ ভারতের অতি দরিদ্র জনসংখ্যা ছিল ২৬.৩ শতাংশ। ২০১৯-এ তা কমে হয়েছে ১১.৬ শতাংশ। ২০১১ সালে শহরাঞ্চলে দরিদ্র ছিল ১৪.২ শতাংশ। ২০১৯-এ তাও ৬.৩ শতাংশে নেমেছে। আট বছরে ভারতের শহরে দারিদ্রের হার কমেছে ৭.৯ শতাংশ। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ) একটি গবেষণা পত্রে দাবি করেছিল, ভারতে অতি দরিদ্র প্রায় শূন্য হওয়ায় পথে। আইএমএফের সেই দাবিকেই কার্যত স্বীকৃতি দিল বিশ্বব্যাঙ্কের এই রিপোর্ট। ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় বেড়েছে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের। তার কারণ এই সময়ে বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের সুবাদে সাধারণ মানুষের হাতে সরাসরি টাকা কিংবা খাদ্যশস্য পৌঁছে গিয়েছে।

কিছুদিন আগেই এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছিল— নরেন্দ্র মোদী জমানায় ভারতের প্রায় ২৭ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে নেমে গিয়েছে। যা নিয়ে বিরোধীরা সুর চড়িয়েছিল। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের গবেষণা পত্র বলছে মোদী জমানায় অতি দরিদ্রের সংখ্যা তলানিতে। এই রিপোর্টে বিরোধীরা নিঃসন্দেহে ধরাশায়ী হবে।

পূর্ণকালীন
গো-গ্রাম প্রশিক্ষক

সেবাভাবী এবং সম্পূর্ণ সময় দিয়ে বাংলার গ্রামে-গ্রামে গিয়ে চাষিদের প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক স্বয়ংসেবকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্য সাম্মানিকের ব্যবস্থা করা হবে।

নাম..., বয়স (৩৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে)..................................

ঠিকানা..., ফোন নং...

Whatsapp...

শিক্ষা (ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ)...

সঙ্ঘ প্রবেশ (কমপক্ষে ১০ বছর).........................., সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ...

আবেদন ই-মেল-এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে— **GOSEVAPARIVAR@GMAIL.COM**

Mobile No. 9331027471

নিবেদক : গোসেবা পরিবার (ট্রাস্ট), কলকাতা

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ২৯।।